বেলুড় থেকে বাদামী

ম্যাঙ্গালোর, বাদামী-আইহোল-পাট্টাডাকাল, বিজয়নগর-
হাম্পি
ও বেলুড়-হলেবিদ ভ্রমণ

বিপুল সাহা

Belur Theke Badami
by Bipul Saha

Price

ওয়েব প্রকাশ কাল ঃ নভেম্বর, ২০১১

গ্রন্থস্বত্ব ঃ ভারতী সাহা

চিত্রসজ্জায়
প্রচ্ছদচিত্র ঃ কিংশুক সরকার

অ(র বিন্যাস ও প্রচ্ছদ রূপায়ণ ঃ রূপা পাল

মুদ্রক ঃ

প্রাপ্তিস্থান ঃ

বিনিময় মূল্য ঃ

ভূমিকা

রচনাটি 'শতপর্ণী' ত্রৈমাসিকে আট খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। কিছু সংশোধন-পরিমার্জন করে বর্তমানে তা পুস্তকাকারে প্রকাশনের অপে(ায় ছিল অনেকটা সময়। তবে তার আগেই ওয়েব-সাইটে প্রকাশ করার ব্যবস্থা হল গ্রন্থের আংশিক ভাগ। এতদ্বারা লাভ হল এই যে প্রচুর রঙিন চিত্রমালা দিয়ে গ্রন্থটি সাজানো সম্ভব হয়েছে যা মুদ্রিত গ্রন্থে সুলভ হত না।

আশা করি নতুন প্রজন্মের বাংলা ভাষার পাঠক-পাঠিকার কাছে ভ্রমণের আলোকে ইতিহাস-স্থাপত্য-ভাস্কর্য বিবরণও সমাদৃত হবে।

নমস্কারান্তে।

বিপুল সাহা

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড
কোলকাতা-১০

সূচীপত্র

১। ভূমিকা	৬
২। ম্যাঙ্গালোর যাত্রা	৭
৩। ম্যাঙ্গালোর	১৪
৪। বাদামীর পথে	২৮
৫। পাট্টাডাকাল	৩৫
৬। বাদামী গুহামন্দির ...	
৭। আইহোল	
৮। হসপেট	
৯। বিজয়নগর	
১০। হাম্পির ধবংসাবশেষ	
১১। হসপেট থেকে বেলুড়	
১২। হলেবিদ	
১৩। চেন্নাকেশব মন্দির	
১৪। আবার ম্যাঙ্গালোর	
১৫। ফেরা	

লেখকের অন্যান্য বই

১। পার্ল হার্বার
২। কার্গিল কাশ্মীর
৩। ঈশ্বের দেবতা ও সৃষ্টি
৪। অমরনাথ ও বৈষ্ণোদেবী দর্শন
৫। কুমায়ুন ভ্রমণ
৬। সাগরে মন্দিরে নীলাচল
৭। প্রলয় দানব সুনামি
৮। ধর্ম ভাবনা বিজ্ঞান ভাবনা
৯। হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণ
১০। অরূপ খাজুরাহো
১১। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

বেলুড় থেকে বাদামী

১। ভূমিকা

শিলাপ্রস্তরে কি সংগীতসৃষ্টি হয় অথবা নিটোল গীতিকাব্য?

কঠিন প্রস্তর এক রূঢ় ও বাস্তব বস্তুখণ্ড। একদা তা থেকে মানুষ নির্মাণ করেছিল যুদ্ধাস্ত্র। প্রকৃতিদেবী শিলাপ্রস্তরে পাহাড়-পর্বত রচনা করেন, দেশ-মহাদেশ-মহাসাগর ব(ধারণ করেন। সাদা, কালো, ধূসর, লাল, সবুজ তার নানা রঙ। সেরকম কঠিন শিলায় কি অলৌকিক সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা যায়? এমন রূপলাবণ্য যাতে স্বপ্ন নেমে আসে স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে, যাতে স্বর্গের অপ্সরা কিংবা সুরসুন্দরীর উজ্জ্বল সম্পদ অঝোর ধারায় বর্ষিত হতে পারে? গন্ধর্বকন্যারা সেখানে বিচরণ করবেন, দেবতারা নেমে আসবেন মর্ত্যের ধূলায়, পৃথিবীর পশুপাখিরা নির্ভয়ে সারিবদ্ধ হয়ে অপে(া করবে সেই অলৌকিক জয়গানের?

শিলাপ্রস্তরে আদিম মানুষ এঁকেছিল চিত্রকলা। ইতিহাসের মানুষেরাও কত কথাই লিখে যায় প্রস্তরগাত্রে! নির্মাণ করেছিল আয়ুধ ও যন্ত্র, তৈরী করেছে ঘরবাড়ি প্রাসাদ ও উপাসনার স্থল। সেসব কেজো কথা। তার কথা হচ্ছে না। হচ্ছে মুগ্ধতার কথা, কলাশিল্পের কথা। এই যেমন, অনন্ত প্রকৃতি রূঢ় প্রস্তরেও কেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে পরম মমতায়। পাহাড় পর্বতে গুহাকন্দরে — মানুষ ছুটে ছুটে যায় তার রূপসুধা পান করতে। মানুষের হাতেও কঠিন প্রস্তর অনিন্দ্যসুন্দর রূপে উদ্ভাসিত হতে পারে। তা না হলে তো ভাস্কর্য হয় না, স্থাপত্য হয় না। সেসব সঙ্গীতের মতো, কাব্যের মতোই মধুময়। সুনিপুণ শিল্পকলা। তাকে চা(শিল্প বলুন বা সূক্ষ্ম কা(শিল্প।

মন্দিরময় ভারতীয় স্থাপত্যকলা ও অনুপম ভাস্কর্যের এক বিশিষ্ট উন্মেষ ঘটেছিল কর্ণাটকের চালুক্য রাজবংশের বাদামী-আইহোল-পাট্টাডাকালে। চূড়ান্ত বিকাশ হয় হোয়সালদের বেলুড়-হলেবিদে। তার কিছুটা স্বা(র আছে বিজয়নগরের হাম্পিতে। আমরা এবার স্থাপত্য-ভাস্কর্যের সেই শৈশব-লীলাভূমি থেকে শু(করে মন্দির-শিল্পের এক চূড়ান্ত বিকাশভূমিতে পা রাখব। সেই কলাশিল্প বিকাশের অরূপ নিবেদনে উদ্ভাসিত হতে হতে কিছু কথা ও কাহিনী জানব। শিলাপ্রস্তরে গীতিকাব্যের মূর্ছনা শুনব। বেড়াতে বেড়াতে।

২। ম্যাঙ্গালোর যাত্রা

অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল দা(ণাত্যের উত্তর কর্ণাটক অঞ্চলে ভ্রমণে যাব। ইচ্ছেটা সত্যি অনেকদিনের — কলেজ জীবনে 'রম্যানি বী(্য' ভ্রমণ-উপন্যাস পড়তে পড়তে। সুযোগ মিলেছে প্রায় চার দশক পরে। সবটাই ভ্রমণ বা নির্জলা বিলাসিতা নয়। তেমন-করে-জ(রী-নয়, আবার হলে-ভালো-হয়-গোছের কর্তব্যকর্ম রয়েছে খানিকটা। সেই সঙ্গে ভ্রমণ। সৌজন্যে কন্যাসমা দীপিকা এবং জামাতা চিন্ময়। কর্তব্যকর্ম সারতে যেতে হবে সুদূর ম্যাঙ্গালোর। দিনকয়েক সেখানে অবস্থান করতে হবে। যাত্রার সম্ভাব্য তারিখ ২৯শে জুলাই। ২০০৩ সাল।

পয়লা বৈশাখের দিন চিন্ময় বলল — বুঝলেন মশাই, ভাও তুমিও শোন, আগস্টে চিরদীপকে নিয়ে গিয়ে ওকে সেট করে আসতে হবে নতুন হোস্টেলে। সঙ্গে নতুন হোস্টেলের জন্য কেনাকাটা আছে। ওর সেকেণ্ড ইয়ারের ফিস জমা দিতে হবে একত্রিশে জুলাইর মধ্যে। মানে যেদিন তোমরা ম্যাঙ্গালোর পৌঁছবে সেদিনই। সেটা মণিপাল গিয়ে করতে হবে। বুঝতে পারলে তো কি বললাম?

— তারপর আপনারা একটু ঘুরেফিরে বেড়াতে পারেন ইচ্ছে করলে। শুধু আমাদের জানাবেন কবে আপনাদের ফেরার টিকিট কাটব। দীপিকা বলল।

এ ব্যবস্থা চার মাস আগে থেকেই ছকে রাখা হয়েছিল। আমাদের ঠিক করা বাকি ছিল, ম্যাঙ্গালোর থেকে এই সুযোগে কোথায় কোথায় বেড়াতে যাওয়া যায়? সময়টা ঘোর বর্ষাকাল। গোয়া-ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার ইচ্ছে নেই। তি(পতির কথাটা মনে হচ্ছিল। অথবা আরেকবার কন্যাকুমারী। বেলুড়-হলেবিদও খুব কাছে। আরেকবার ঘুরতে মন্দ লাগবে না। জোগ ফলস ধারেকাছে। দেখা হয় নি আমাদের। হাম্পি-বাদামীর কথা তখনই মনে হল। অনেকটা দূর কি ম্যাঙ্গালোর থেকে? যাওয়া যায়? চিরদীপকে খবর দিলাম — পারলে খোঁজ নিও তো তোমাদের ম্যাঙ্গালু(থেকে বাসটাস যায় কিনা ওদিকে।

জানা গেল যে বাসে বাসে ম্যাঙ্গালোর থেকে বেলুড়-হলেবিদ-হাম্পি হয়ে বাদামী যাওয়া যায় অনায়াসে। তারপর হুবলী হয়ে অমরাবতী দেখে বিজয়ওয়াদায় এসে করমণ্ডল এক্সপ্রেস ধরলেই হল। বাগড়া দিল সহধর্মিনী। দাবী — ফেরার আগে চিরদীপকে আরেকবার দেখেশুনে তবে বাড়ি ফিরব।

তাহলে তো ঘুরেফিরে আবার ম্যাঙ্গালোর ফিরে যেতে হয়। আর রোববার থেকে রোববারের মধ্যে ম্যাঙ্গালোর বাদে অন্য ঘোরাফেরা সাঙ্গ করতে হয়। হাতে তখন মাত্র

দিনছয়েক সময় থাকে। দীপিকাকে জানানো হল — তবে এক কাজ কর, মামণি। আমাদের বেড়ানোর জন্য এক সপ্তাহ বরাদ্দ করে ম্যাঙ্গালোর থেকেই ফেরার টিকিট কাটো। তারপরে দেখছি কোথায় কোথায় যাওয়া যায়।

সেইমতো ট্রেনের টিকিট কাটা হল। রেলপথে কোলকাতা থেকে মাদ্রাজ তথা চেন্নাই হয়ে ম্যাঙ্গালোর যেতে হয়। মুম্বাই বা ত্রিবান্দ্রম থেকেও রেলসংযোগ আছে। আমরা চেন্নাই হয়ে যাব এবং ওই পথেই ফিরব। চিরদীপকে নিয়ে ম্যাঙ্গালোর যাত্রার তারিখ ২৯-শে জুলাই মঙ্গলবার।

এবার আর স্লিপার টিকিট নয়। থ্রি-টায়ার এসির তিনখানা টিকিট হাতে — মূল্য তিন হাজার সাতশ সাতাত্তর টাকা। আমরা দুজন বয়স্ক নাগরিক হিসেবে গণ্য হয়েছি বলে খানিকটা আর্থিক সুবিধে দিয়েছে রেল — শতকরা ত্রিশ টাকা হারে। এটুকু সুবিধের জন্যই ধন্যবাদ জানাতে পারি সরকারকে। নয়তো সঞ্চয়ের উপর সুদের হার যেভাবে কমেছে, তাতে বয়োবৃদ্ধদের প্রাণে মারার আয়োজন সম্পূর্ণ হতে চলেছে।

শুভ্যাত্রা ঘোর অমাবস্যার দিনটিতেই। দিনবদলের উপায় নেই। চিরদীপকে পয়লা আগস্ট থেকে ক্লাস করতে হবে কস্তুরবা মেডিকেল কলেজের কলেজ অব ডেন্টাল সার্জারিতে। সুতরাং আগের দিনই পৌঁছনো দরকার। তিথিন(ত্র মানামানির সুযোগ নেই। আসলে আমরা ভাবছিলাম যদি পূর্ণিমা রাতে হাম্পি বা বেলুড়ে থাকা যেত, তবে চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এক আশ্চর্য মায়াবী স্বপ্ন নেমে আসত। আর গন্ধর্বকন্যারা প্রস্তরমূর্তি থেকে বুঝি বেরিয়ে পড়ত সঙ্গীতের রাগ-অনুরাগে আর নৃত্যছন্দে আবিষ্ট হয়ে। সেই অলৌকিক মায়াজালে মগ্ন থাকার লোভ ছিল।

নির্দিষ্ট দিনে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে গেলাম রিপন স্ট্রীট। দীপিকা গাড়ি করে হাওড়া পৌঁছে দিল। ২৮৪১ আপ করমণ্ডল এক্সপ্রেস ছাড়ল দুপুর ২-২৫শে। চেন্নাই পৌঁছনোর কথা বুধবার সন্ধ্যা ৫-৩৫য়ে। ১৬৭৫ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথ পাড়ি দেবে ঝমঝমিয়ে। সুপারফাস্ট ট্রেন — গড় গতিবেগ ঘন্টায় ষাট কিলোমিটার।

চেন্নাই থেকে সন্ধ্যা সাতটায় ধরতে হবে ৬৬০১ আপ চেন্নাই-ম্যাঙ্গালোর মেল। পয়লা জুলাই থেকে নতুন টাইমটেবিল। ট্রেনের প্রস্থানকাল কখন সঠিক জানা যায়নি। ৮৮৯ কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছবে পরদিন দুপুর একটায়। মোট দূরত্ব অতিত্র(ম করতে হচ্ছে ২৫৬৪ কিলোমিটার। প্রায় সাড়ে সাতচল্লিশ ঘন্টার জার্নি — সোজাসাপটা দুটো দিন।

খড়্গপুর ছাড়িয়ে ট্রেন প্রথমে পৌঁছল বালে(ের। দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে। ভদ্রক হয়ে ভুবনে(ের পৌঁছেছে রাত নটার পরে। রাতের ভোজন সেরে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল যাত্রী সকলে।

চিরদীপ ট্রেনে উঠে প্রথমেই আমাদের সাবধান করে দিয়েছে — ম্যাঙ্গালোর যাচ্ছে এমন যুবক দেখলে, বুঝেছ ভালোদিদি-জামাইবাবু, তোমরা বলবে না যে আমরাও ম্যাঙ্গালোর যাচ্ছি। কারণ কলেজের সিনিয়র দাদাদের মুখে পড়ে গেলে তারা ট্রেনে বসেই র‍্যাগিং শু(করে দিতে পারে।

উহ্ র‍্যাগিং! সভ্য সমাজের অসভ্য প্রকাশ। নবাগতদের পীড়নের মধ্যে দুচার বছর এগিয়ে থাকা প্রাচীনদের এ কী আচরণ? একটু আধটু পিছনে লাগা মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু র‍্যাগিং নামে যা হচ্ছে তা মেনে নেওয়া দুষ্কর।

বললাম — না না ট্রেনে তেমনটা হবে না। মিথ্যেই ভয় পাচ্ছ।

কামরায় আলাপ করতে এল দু'টি যুবক। প্রথমে খানিকটা এড়িয়ে যাচ্ছিলাম। ছেলেদুটি বেশ মিশুকে। আমরা বাঙ্গালী জানার পরে ইংরেজীর খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল। একেবারে কাঠ বাঙাল ভাষায় আত্মপ্রকাশ করল। তারা ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে এসেছে। রোগা ছেলেটির নাম মোর্শেদ আলম। আর ফর্সা সুন্দরপানা ছেলেটির নাম মুরাদ শিকদার। দু'জনেই চট্টগ্রামের ছেলে। ব্যাঙ্গালোরে কম্পুটার নিয়ে পড়তে যাচ্ছে।

আরাকান রাজ্যের পাশে চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকা। একদা বৌদ্ধধর্মেরও বিশেষ প্রভাব ছিল। সমুদ্রবন্দর কক্সবাজারের কথা শুনেছি। পাহাড় আর সমুদ্র মিলেমিশে রয়েছে এখানে। চট্টগ্রামের কথা বলতে ছেলেদুটি উৎসাহিত হয়ে উঠল। বারবার বলল — একবার বাংলাদেশে আসুন না! ঢাকার সঙ্গে কোলকাতার তো কোন তফাত নেই।

বাংলাদেশের সঙ্গে প্রত্য(সংযোগ নেই আমার। যা কিছু যোগাযোগ পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত। হ্যাঁ, বারদুয়েক সেদেশে বেড়াতে যাওয়ার দুর্বল স্মৃতি আছে বটে, তবে তাতে আত্মিক সংযোগ গড়ে ওঠার কথা নয়। তবু যেন কোথাও শিরশিরে ব্যথা বাজে। বোধ হয় একেই শিকড়ের টান বলে। আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসীরা মাতৃভাষা হারাতে বসেছি আর বাংলাদেশের কল্যাণে বাংলাভাষা সেদেশের রাষ্ট্রভাষা।

পাশের সিটে বসেছিল গৌতম ভট্টাচার্য। কোন্নগরে বাড়ি। যাদবপুর থেকে ভূবিজ্ঞান নিয়ে পি-এইচ-ডি করেছে। কারকালাতে ও-এন- জি-সি'র চাকরী নিয়ে যাচ্ছে কর্মস্থলে যোগ দিতে।

ভূ-বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার একদা আমার খুব আগ্রহ ছিল। পড়া হয়নি। একথা বলতে গেলেই ভারতী নির্ঘাৎ মনে করিয়ে দেবে — সত্যজিৎ রায়ের সেই সিধু জ্যাঠার মতো ব্যাপারখানা আর কী! অনেক কিছুই হতে পারতুম, তাই কিছুই হতে পারিনি, শুধু মনের জানালা খুলে বসে আছি। অনেক কিছু হতে পারতুম কি না বলা শক্ত(, তবে কিছুই যে হতে পারে নি সেটা নিশ্চিত।

ভুবনেশ্বর পেরিয়ে গিয়েছে। এবার শয়নের ব্যবস্থা করতে হয়। বিশাখাপতনম কখন পৌঁছেছে এবং ট্রেনের ল্যাজা-মুড়ো উল্টে গিয়েছে, জানি না। ঘুমটা জব্বর হয়েছিল। চল্লিশ বছর আগে বিশাখাপতনমে এসেছিলাম এন-সি-সি ক্যাম্প করতে। তখন দেখেছি সমুদ্রসৈকত, শিপ-ইয়ার্ড, গ্রীন ডলফিনস নোজের লাইটহাউস এবং বিশ কিলোমিটার দূরের সীমাচলম যেখানে নৃসিংহদেবের মন্দির আছে। পরে ভারতীকে নিয়ে আরেকবার আসা হয়েছিল ভাইজাগে। সেও প্রায় বাইশ বছর আগে। সময়াভাবে বোরা কেভস আরাকু জগদলপুর যাওয়া হয়নি। যেতে হবে একবার।

পরবর্তী স্টেশন রাজামুন্দ্রী। ১০৮১ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে গোদাবরী নদীতীরের রাজামুন্দ্রীতে পৌঁছল সকাল সওয়া আটটা নাগাদ। মাত্র আধঘন্টা দেরীতে। অন্যতম দীর্ঘ রেলসেতু এখানে। ছাপ্পান্নটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে। সেদিন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী রাজামুন্দ্রী আসছেন গোদাবরী পুষ্করমের উৎসব উপলক্ষ্যে স্নানযাত্রার সূচনা করতে। স্টেশন চত্বরে তারই আয়োজন। উৎসব চলবে বার দিন ধরে। সপ্ত গোদাবরী তীর্থম — ১৬৪ খানি ঘাট আছে সমগ্র অন্ধ্রে। আর কিছু মহারাষ্ট্রে। তার কোন একটি ঘাটে একবার স্নান করতে পারলেই এক ঘট পুণ্য। এদেশবাসী ভয়ানক পুণ্য-বাতিকে ভোগে।

ট্রেন বিজয়ওয়াদা পৌঁছল সওয়া এগারটায়। লেট চলছে মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট। হাওড়া থেকে বিজয়ওয়াদার দূরত্ব ১২৩১ কিলোমিটার। গত বছর মে মাসে চিরদীপকে নিয়ে সিইটি পরীক্ষা দিইয়ে ব্যাঙ্গালোর থেকে ফেরার সময় এখানে প্রবল উত্তাপে প্রায় শুকনো খোলায় ভাজা ভাজা হতে হয়েছিল। টিকিট পাওয়া যায়নি বলে স্লিপার ক্লাসে যেতে হয়েছিল। এবার তাই একটু আরামের আয়োজন করে রেখেছে কন্যা-জামাতারা। আমাদের অবশ্য স্লিপার ক্লাসে যাওয়া নিয়ে কোন সমস্যা নেই। বরঞ্চ পায়ের উপর পা তুলে মধ্যবিত্ত মেজাজে জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যায়।

কৃষ্ণা নদীর তীরে বিজয়ওয়াদা। অতীতে নাম ছিল বিজয়বটিকা। বিজয়ওয়াদা এলেই আমার অমরাবতীর কথা খুব মনে হয়। মাত্র ২৬ কিলোমিটার দূরে। সাঁচীর থেকেও বড়ো স্তূপ। কাছেই অতীতকালের সাতবাহনদের রাজধানী ছিল ধান্যকটক। আর আছে নাগার্জুনকোণ্ডা। একবার যেতে হবে।

চেন্নাইর পূর্বনাম মাদ্রাজ। পর্তুগিজ দলপতি ম্যাড্রার নামানুসারে। আরো প্রাচীন নাম ছিল চেন্নাপতনম। বিদেশী নাম বর্জন করে আবার চেন্নাই হল।

বিজয়ওয়াদার পরে এক লম্বা দৌড় ৪৩২ কিলোমিটারের। ট্রেন যতটুকু লেট রান করছিল, সব ধুয়েমুছে সাফ চেন্নাই পৌঁছতে পৌঁছতে। পথসঙ্গীদের বিদায় জানিয়ে এবং ঠিকানা বিনিময় করে যে যার পথে। আমাদের দু'ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে পরবর্তী জার্নির জন্য। ইচ্ছে করলে একবার ম্যারিনা বিচ ঢুঁ মেরে আসা যেত। ম্যারিনা বিশ্বের

দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্রসৈকত। কেউ রাজি হল না। মোর্শেদ আর মুরাদ বলছিল, ওরা সি-বিচ দেখতে যাবে স্টেশনের লাগেজ (মে মালপত্র জমা রেখে।

আমাদের মালপত্র টেনে আনা হল নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে যেখানে ম্যাঙ্গালোরের ট্রেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। রিজার্ভেশন লিস্ট তখনো টাঙানো হয়নি। সুতরাং অপেক্ষা করতে হবে। চিরদীপ মোবাইলে মাকে জানিয়ে দিয়েছে মাদ্রাজ পৌঁছোনোর খবর। বাড়িতে ভাইপো সন্দীপ্তর কাছে এসটিডি কল গেল।

ম্যাঙ্গালোর মেলের যাত্রাসময় পিছিয়ে গিয়েছে। সাতটার বদলে সাতটা পঁয়তাল্লিশে ছাড়বে। কেরালার যাত্রীই উঠল বেশি। চেন্নাই থেকে ট্রেন ছাড়ল যথাসময়ে। যেতে যেতে আলাপ হল আরেক যুবকের সঙ্গে। বিহারের ছেলে। মণিপাল মেডিকেল কলেজে পি-এইচ-ডি করতে যাচ্ছে। কোলকাতার আর-জি-কর থেকে এম-বি-বি-এস পাশ করেছে।

আরাক্কোনাম, কাটপাডি, জোলারপেট্টাই, সালেম, ইরোদ, পোদানুর হয়ে কেরল রাজ্যের পালঘাট পৌঁছল ভোর রাতে। পালঘাট গ্যাপ থেকেই পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ডিঙিয়ে পূর্বদিক থেকে পশ্চিমে যেতে হয়। এখান থেকে আলেপ্পী যাওয়া যায়। ব্যাকওয়াটারের দেশ আলেপ্পী। তারপর পড়ল শোরানুর জংশন। এখান থেকে গুরুভায়ুর যেতে হয়। শোরানুর থেকে ট্রেন ক্রমে আরব সাগরের তটরেখা ধরে উত্তরদিকে যাচ্ছে। এক রাতের মধ্যে বঙ্গোপসাগর থেকে আরব সাগরের তীরে চলে আসা। পূর্বতট থেকে পশ্চিমতটে।

সকাল হল কালিকট বা কাজিকোড় স্টেশনে। জমোরিন রাজাদের রাজধানী ছিল কালিকট। ১৪৯৮ সালের ২০শে মে তারিখে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা এই বন্দরে অবতরণ করেন।

কালিকটে কামরা প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। একটু পরেই এল কান্নানোর। কোলাত্তিরি রাজাদের রাজধানী ছিল এখানে। এখানে আরেকপ্রস্থ যাত্রীরা অবতরণ করল। অল্পকিছু যাত্রী নিয়ে মাদ্রাজ-ম্যাঙ্গালোর মেল গন্তব্যস্থলে যাত্রা করল। চেন্নাই থেকে দূরত্ব ৮৮৯ না ৯০০ কিলোমিটার তা নিয়ে সামান্য খটকা রয়ে গেল মনে। বাঁহাতে সমুদ্রতীর মাঝে মাঝে দেখা দিচ্ছে আবার হারিয়ে যাচ্ছে সবুজের বিপুল সমারোহ। ছোট ছোট স্টেশন কেমন আটপৌরে ঘরোয়া।

নেত্রবতী নদীর সেতু পেরিয়ে ম্যাঙ্গালোর পৌঁছেছি ভরদুপুরে — প্রায় দুটো নাগাদ। সামান্য বিলম্বে।

অটো নিয়ে সোজা হোটেলে। চিরদীপ বলে রেখেছিল স্টেশন থেকে যাওয়ার সময় অটো কিন্তু মিটারে যায় না। মাত্র ওই একবারই ওরা মিটার ছাড়া চলে। ত্রিশ-চল্লিশ-

পঞ্চাশ টাকা ভাড়া চায়। নয়তো অটো সর্বত্র মিটারে চলে। আমরা যাব কাছেই হাম্পনকাট্টার কাছে বালমাট্টা রোডের হোটেল সূর্যে। অটোচালক দাবী করল মোটে ত্রিশ টাকা। তথাস্তু।

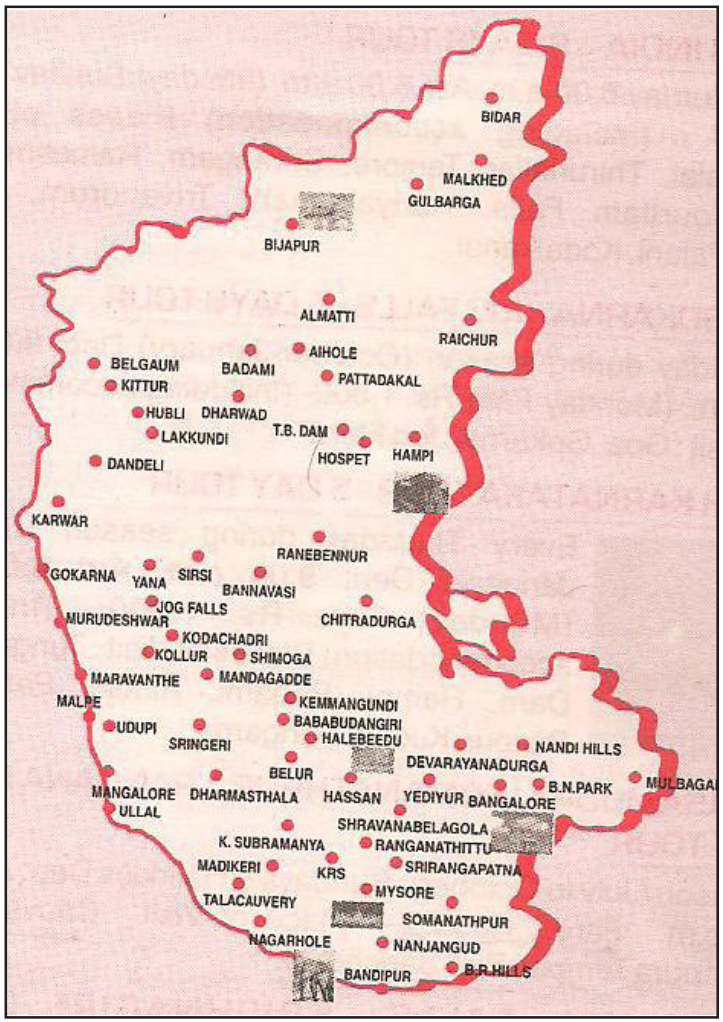

চিত্র-১। কর্নাটকের মানচিত্র

৩। ম্যাঙ্গালোর

কর্ণাটক রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে আরব সাগর তীরে বন্দরনগর ম্যাঙ্গালোর। ওরা বলে — ম্যাঙ্গালু(। কন্নড় ভাষায় শব্দের শেষে স্বরবর্ণ থাকার প্রবণতা আছে। দ(িণ কানাড়া জেলার সদর দপ্তর এই নগরে।

পাহাড়-টিলায় উঁচুনিচু জমিন। ওয়েস্টার্ন ঘাট তথা সহ্যাদ্রি পর্বতমালার কোলে। সাড়ে চার ল(লোকের বাস। শুনে এসেছি — লাল টালিতে ছাওয়া বাংলোধর্মী বাড়ি আর লাগোয়া বাগিচা ছিল অতীতকালের বৈশিষ্ট্য। এখন পুরোদস্তুর ঝা-চকচকে আধুনিক শহর হয়ে উঠেছে। বাংলোবাড়ি ত্র(মে বিদায় নিচ্ছে। হিন্দু আছে, মুসলমান আছে, ত্রি(শ্চান আছে। ক্যাথলিক ধর্মের বিশেষ প্রভাব আছে। প্রত্যূষে মসজিদের মোয়াজ্জিনের সঙ্গে সঙ্গে চার্চের ঘন্টা ও মন্দিরের কাঁসর-ঘন্টার কোরাসে অভিনবত্ব আছে বলে দাবি করা হয়। দাবিটা কতদিন টিকবে বলা শক্ত(।

ম্যাঙ্গালোর পৌঁছেই প্রথম কাজ চিরদীপের কলেজে গিয়ে দ্বিতীয় বর্ষের জন্য ফি হিসেবে চেক জমা করা। হিসেব কষে সম্পর্ক যাচাই করলে চিরদীপ আমাদের দৌহিত্র। ভারতীর অগ্রজা পার্বতীরানির কন্যা দীপিকাকে ভারতী একান্ত আপন করে লালন করেছিল শিশুকালে। বাল্যকালের সেই সুখস্মৃতি অ(য় হয়ে রয়েছে সুখ-সম্পর্কে। বিবাহের পরে জামাতাটিও সে সম্মান অটুট রেখেছে। সব মিলিয়ে দীপিকাকে কন্যাসমা না বলে, কন্যা বলাই শোভন। তার পুত্রের সঙ্গে ভারতী ভাই সম্পর্ক স্থাপন করে আমাকে একটি (দ্র শ্যালক উপহার দিয়েছে কয়েক বছর আগে। (দ্র বললাম বটে, আসলে শ্যালকটি দীর্ঘকায় প্রায় ছ' ফুট লম্বা। ডেন্টাল কলেজে পড়ছে। দ্বিতীয় বর্ষে উঠল প্রথম হয়ে।

হোটেল সূর্যের ঘরভাড়া দৈনিক আড়াইশ' টাকা। টিভি ব্যতিরেকে দুশ'ও হতে পারত। মামণিরা সাধারণত ওঠে গণপতি হাইস্কুল রোডের হোটেল শ্রীনিবাসে। ব্যবস্থাপনায় সেটা আরেকটু ভালো। তবে চিরদীপের কলেজের ঠিক পিছনে হওয়ার দ(ণ হোটেল সূর্য থেকে ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার সুবিধে বেশি।

স্নানাদি সেরে চিরদীপের কলেজে গেলাম। লাইটহাউস হিল রোডে কলেজ। শিবরাম করন্থ রোড দিয়েও যাওয়া যায়। এদিকটা কলেজের পিছনদিক। জানা গেল — ফিস জমা দিতে মণিপাল যেতে হবে না, ম্যাঙ্গালোরের কলেজেই বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। মিনিট পনেরোর মধ্যে চেক জমা করে দিতে পারলাম। তারপর গেলাম হাম্পনকাট্টার কাছে লাঞ্চ সারতে। নিউ তাজমহল হোটেলে।

লাঞ্চ সেরে অটো নিয়ে ওর নতুন আস্তানায়। এবছর থেকে চিরদীপ থাকছে বালমাট্টার কাছে কর্ণাটক ত্রি(শিয়ান এডুকেশন সোসাইটির হোস্টেলে। জ্যোতি সার্কেল থেকে সামান্য এগিয়ে হোস্টেল। প্রথম বছর কলেজ-হোস্টেলেই ছিল। সেকেন্ড ইয়ার থেকে আবাস বদলাচ্ছে। আসলে ও শান্তিপ্রিয় পড়ুয়া ছেলে। কলেজ হোস্টেলের হৈ হুল্লোড় তেমন পছন্দ করে উঠতে পারে না। তার উপর এবার র‍্যাগিং নামক হাড়-হিম করা একটা ব্যাপার আছে। এখানে সিনিয়র ছাত্ররা কর্তৃপ(র নজরদারিতে প্রথম বছর নতুন ছাত্রদের নাগাল পায় না। সেজন্যে ওরা র‍্যাগিং করে সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রদের উপর। চিরদীপের র‍্যাগিং ব্যাপারটায় ভয়ানক ভীতি আছে।

হোস্টেলের দোতলায় সামনের দিকে আঠার নম্বর কামরা। (মমেটের নাম বিজয় জনসন। ত্রি(শ্চান মেডিকাল কলেজে মেডিকাল মাইক্রে(াবায়লজি নিয়ে পড়াশুনা করছে। এ বছর ফাইনাল ইয়ার।

কিন্তু এ কী ঘরের অবস্থা! বসবাসের ঘর তো নয়, এর নাম হতে পারে ডাস্টবিন। যত্রতত্র বইপত্র ছড়ানো। ব্যবহৃত জামাকাপড় ছড়িয়েছিটিয়ে। জিনিসপত্র এখানে ওখানে গড়াগড়ি খাচ্ছে। একটা ভ্যাপসা দুর্গন্ধ বাতাস ভারী করে রেখেছে। চিরদীপের নিজস্ব আলমারির অবস্থা আরো সঙ্গিন। ভিতরটা ভয়ানক স্যাঁতসেঁতে।

কামরার অবস্থা দেখে হাহুতাশ করে লাভ নেই। আপাতত এখানেই থাকতে হবে। তিনজনে লেগে গেলাম সংস্কারকার্যে। ইতিমধ্যে বিজয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওর কাছ থেকে জানা গেল অন্যান্য টুকিটাকি কেনাকাটা কোথা থেকে করা যেতে পারে। সেই মতো বিকেলবেলা মার্কেট রোডে গেলাম ম্যাট্রেস এবং অন্যান্য জিনিস কিনতে।

নেত্রবতী ও গু(পুর নদীর সঙ্গমে আরব সাগরের উপকূলে বন্দর-নগর ম্যাঙ্গালোর তথা মঙ্গলপুরম। নাথ সম্প্রদায়ের গু(মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্যা মঙ্গলাম্মার নামে শহরের নাম। এ ঘটনা হয়তো দশম শতকের।

মালাবার দেশের রাজকুমারী (মতান্তরে রানি) প্রমীলা নাথধর্মে দী(ত হয়ে মঙ্গলা হয়েছিলেন। তাঁর নাম থেকেও হতে পারে ম্যাঙ্গালোর নামকরণ। প্রাচীন নাম 'আলুভে কোদি'। কোদি অথবা কুদলা। তুলু ভাষায় 'আলুভে' মানে দুই নদীর সঙ্গমস্থল। 'কোদি' বলতে বোঝায় দুটি জলের উৎস অথবা এক নদীর সঙ্গে আরেক নদী যেখানে মিলিত হয়। ষষ্ঠ শতকের 'কোসিয়াস ইন্দিকো প-ুস্তি' গ্রন্থে মাঙ্গা(থ নামে এক বন্দরের উল্লেখ আছে। পি-নির 'ন্যাচারাল হিস্ট্রি' গ্রন্থেও ভারতের সমুদ্রপথের কথাপ্রসঙ্গে ম্যাঙ্গালোরের উল্লেখ আছে। তিনি নেথ্রিয়াস নামের এক নদীরও উল্লেখ করেছেন। প্রথম শতকের টলেমি নিত্রা নামক এক নদীর কথা বলে যান। এঁরা দুজনেই বোধহয় নেত্রবতী নদীর কথাই বলতে চেয়েছেন।

নেত্রবতী নদী? বেশ নামটি তো!

প্রবাদ আছে, ভৃগুবংশীয় জমদগ্নির কনিষ্ঠ পুত্র পরশুরাম — প্রবল পরাত্র(মশালী (ত্রসুলভ ব্রাহ্মণ ছিলেন। পিতৃ-আজ্ঞা পালনে মাতার শির(ছেদ করেছিলেন। একুশবার পৃথিবীকে নিঃ(ত্রিয় করেছিলেন। সেই পরশুরাম একদা তাঁর কুঠারখানি নি(প করেন সমুদ্রজলে। ভীত হয়ে সমুদ্রের রাজা পরশুরামকে কুঠার তো প্রত্যর্পণ করলেনই, সেই সঙ্গে কিছুটা ভূখণ্ডও পুরষ্কার স্বরূপ অর্পণ করলেন। বর্তমান ম্যাঙ্গালোর সেই অর্পিত স্থান — তাই এই ভূখণ্ড 'পরশুরাম শ্রুস্তি' বলে গণ্য হয়। উপকূলবর্তী দেশ বলে এতদঞ্চলে কদলী জন্মায় প্রচুর পরিমানে। আর নারকেল।

বরাহ অবতার রূপে ভগবান বিষু(ও নাকি নিকটবর্তী পর্বতশিখরে অবস্থান করছেন। তাঁর নয়নবারি থেকে উদ্বেলিত জলরাশি পবিত্র নেত্রবতী নামে পর্বত থেকে সমতলে প্রবাহিত হয়েছে। তারপর কুমারধারার সঙ্গে যুক্ত(হয়ে আরো পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে সাগরসঙ্গমে ডুব দেওয়ার আগে গু(পুর নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। পতিত হয়েছে পশ্চিম সাগরে। মঞ্জুনাথ এবং সহস্রলিঙ্গে(ের এতদঞ্চলের বিশেষ পূজ্য দেবতা। দাবি করা হচ্ছে যে সহ্যাদ্রি পর্বতমালার উপর এই স্থান ঋষি কণ্ব, ব্যাসদেব, বশিষ্ঠ ও বি(োমিত্রর সাধন-স্থলও ছিল।

অতি প্রাচীনকালে তৌলভ বংশের রাজারা এখানে রাজত্ব করতেন। তাদের ভাষাই বোধ হয় এতদঞ্চলের তুলু ভাষা। তো একদা বিন্ধ্যবাসিনী জগন্মাতা দেবী মনস্থ করলেন যে এই তৌলভ দেশে — মঞ্জুনাথের কদলী(ত্রের দ(ণ ভূখণ্ডে — তিনি বিরাজ করবেন। মুনি পরশুরাম সেকথা জ্ঞানশচ(জানতে পারলেন এবং তাঁর মঙ্গলময় আবির্ভাবে উদ্দীপিত হয়ে নানা (ে-াকে মাতৃবন্দনা করলেন। দেবী আনন্দিত হয়ে পরশুরামকে জানালেন যে জগন্মাতা এখানে স্বনামে নয়, মঙ্গলাদেবী নামে পরিচিত হবেন। পরশুরাম সেই মতো দেবীকে প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর জন্য মন্দির নির্মিত হল। মন্দির নির্মাণে সহায়তা করেন স্বর্গের শিল্পী স্বয়ং বি(েকর্মা।

অতীতে তুলুদেশ নামের উপকূলরাজ্যে বীরবাহু নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ঋষি ভরদ্বাজের ভক্ত(শিষ্য ছিলেন। বয়োবৃদ্ধ হলে গু(র সম্মতিত্র(মে অ্যানেগোন্ডির ভঙ্গ রাজাকে তুলুরাজ্য সমর্পণ করে রাজা-রানি বানপ্রস্থে চলে গেলেন। বীরবাহুর প্রদর্শিত পথেই ভঙ্গরাজা তুলুদেশ শাসন করতে থাকেন।

এদিকে বিনায়ক দেবতাও মঙ্গলাম্মার পুণ্য(ত্রের একাংশে শরপুর বা শরভু নামক স্থানে অধিষ্ঠিত হতে বাসনা করলেন। বিনায়কদেব তখন দেবী মঙ্গলাম্মাকে অনুরোধ করলেন যেন তিনি ভঙ্গরাজাকে স্বপ্নে দর্শন দেন এবং দেবীর নামে এক সুসমৃদ্ধ নগর

প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপর বিনায়ক ও তাঁর পত্নী সর্বেশ্বরা সেই নগরে প্রতিষ্ঠিত হবেন। স্বপ্নদর্শন করে ভঙ্গরাজা দেবী মঙ্গলাম্মার নামে মঙ্গলপুরম নগর প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রতিষ্ঠিত নগর কদলী(ত্র থেকে ভরদ্বাজ-আশ্রম পর্যন্ত প্রসারিত হল।

ঐতিহাসিক কাল থেকে সারা পশ্চিমঘাটের মশলা রপ্তানী হত এই বন্দর থেকে। ষষ্ঠ শতক থেকে গোলমরিচ রপ্তানীতে বিশেষভাবে খ্যাত হয় ম্যাঙ্গালোর। চতুর্দশ শতকে ইবন বতুতার রচনায় এ স্থানের উল্লেখ আছে। ১৫২৯ সালে পর্তুগীজরা ম্যাঙ্গালোর শহর দখল করে নেয়। অষ্টাদশ শতকে হায়দার আলির সময়ে জাহাজ তৈরীর কারখানা বসে এখানে। টিপু সুলতানের নৌবহরের ঘাঁটি ছিল এখানকার সুলতান ব্যাটারিতে।

প্রথমদিন চিরদীপ আমাদের সঙ্গে হোটেলেই থেকে গেল। পরদিন সকালে ও চলে গেল কলেজে। আমরা অটো করে লালবাগ সার্কেল হয়ে বেজাই মেন রোডে কর্ণাটক সরকারের বাস টার্মিনাসে গেলাম দূরপাল্লার বাসের খোঁজখবর করতে।

ম্যাঙ্গালোর বাস টার্মিনাস বিরাট এলাকা জুড়ে। অফিস এনকোয়ারি রিজার্ভেশন ক্যান্টিন বুকস্টল টয়লেট সবই আছে এক ছাদের নিচে। একদিক থেকে বাস আসছে এবং পিছনে ব্যাক করে নির্দিষ্ট স্লটে দাঁড়াচ্ছে। ড্রাইভার-কণ্ডাক্টর দুজনেই ডেকে ডেকে যাত্রী তুলছে।

এনকোয়ারি থেকে জানা গেল যে সোজাসুজি বাদামী যাওয়ার বাস আছে সারাদিনে একটি। বিকেল পাঁচটায়। হাম্পি যাওয়ার জন্য হসপেটের বাস পাওয়া যাবে দুপুর বারোটায়। আসলে এটি হায়দ্রাবাদ যাওয়ার বাস — হসপেট হয়ে যাবে। হুবলি যাওয়ারও বাস আছে। সবই অর্ডিনারি বাস।

হোটেলে ফিরে চিরদীপকে নিয়ে বেরোনো হল ওর জন্য বাকি কেনাকাটা সারতে। তারপর আরেকপ্রস্থ ঘরদোর পরিষ্কার ও গোছগাছ করা হল। এত(ণে ঘরখানা মোটামুটি বাসযোগ্য হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

ইতিমধ্যে একটি দুসংবাদটা এল। হোস্টেলের বন্ধুরা খবর দিল যে কলেজের সিনিয়ররা ফতোয়া জারী করেছে। বলেছে সোমবারের মধ্যে সেকেণ্ড ইয়ার স্টুডেন্টসদের সবাই চুল ছেটে যেন কলেজে আসে। সেলুনে গিয়ে রামদাস কাট বললেই ওরা মিহি করে কদমছাট দিয়ে দেবে। এরকম র‍্যাগিং তবু সহ্যের মধ্যে। এর সঙ্গে আরো একটি সমস্যা এসে জুটল।

নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প পেপারে যে গার্জিয়ান ডিক্লারেশন দেওয়া হয়েছে তা হোস্টেলের কর্তৃপ(গ্রহণ করতে চাইছে না। তাদের দাবি এখানকার স্টেট ব্যাঙ্ক অব মাইসোর থেকে নির্দিষ্ট স্ট্যাম্প পেপার কিনতে হবে। এটা অবাঞ্ছিত আব্দার বলেই মনে

হল। কিন্তু কিছু করার নেই। পরদিন কাঙ্কনাদি হয়ে ভ্যালেন্সিয়াতে গেলাম স্টেট ব্যাঙ্ক অব মাইসোর থেকে দশ টাকার স্ট্যাম্প পেপার কিনতে।

ব্যস, প্রাথমিক কর্তব্য-পর্ব সমাপ্ত। এবার ঘুরে দেখা যেতে পারে ম্যাঙ্গালু(।

শহরের প্রধান দ্রষ্টব্য নিশ্চয়ই মঙ্গলা দেবীর মন্দির। শহরকেন্দ্র থেকে তিন কিলোমিটার দূরে মন্দিরের অবস্থান। সাতাশ নম্বর (টের বাস যায় মন্দির দ্বারে। আমরা অবশ্য অটো ধরে চলে গেলাম সেখানে।

তখন দুপুর বেলা। মন্দিরের দরজা বন্ধ। প্রবেশপথের ডানহাতে উঁচু বেদীতে বৃ(মূলে ছোট্ট মন্দিরে সর্পদেবীর অধিষ্ঠান। বিপরীতে একচালার ঘরে মঙ্গলাদেবীর মন্দির। দু'পাশে পূজাপাঠ প্রসাদ-বিতরণ অফিস ইত্যাদির জন্য সারি সারি ঘর রয়েছে। সামনে দীপস্তম্ভ। এত সাদামাটা মন্দির য়ে এই মন্দির তৈরী করতে বি(শ্বকর্মা এসেছিলেন বলে একবারও মনে হয় না।

কাহিনী বলছে, নাথগু(মৎস্যেন্দ্রনাথ কেরালায় ধর্মপ্রচারে এসে রানি প্রমীলাকে ধর্মান্তরিত করেন। তাঁর নতুন নাম হয় মঙ্গলা বা মঙ্গলে। সেসময় শিষ্য গোরখনাথও কেরালায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন গু(কে নিয়ে নাথ সম্প্রদায়ের ধর্মসভায় যোগদানের উদ্দেশে। গু(মৎস্যেন্দ্রনাথ শিষ্যা মঙ্গলাকে নিয়ে নাসিকের পথে যাত্রা করেন। নেত্রবতী অতিত্র(ম করে বোলারের কাছে গোরেয়া ডাণ্ডে নামক জায়গায় শিষ্যা ঘোরতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকে সেখানে রেখেই গু(কে ধর্মসভায় চলে যেতে হল।

গোরেয়া ডাণ্ডেতে কুটির নির্মাণ করে শিষ্যা মঙ্গলে বসবাস করতে থকেন। কালে কালে নাথ যোগিনী মঙ্গলের জন্য ঐ স্থানের মাহাত্ম্য বেড়ে গেল। আত্তাভুরের বল্লালরা তখন এক শক্তি(মূর্তি স্থাপন করে মন্দির গড়ে তুললে ন। বলা হয়, গু(গোরখনাথ স্বয়ং ঐ মন্দিরের উদ্বোধন করে যান। সম্ভবত ৯৬৮ খৃষ্টাব্দে মঙ্গলেদেবীর জীবনাবসান হয়। এরপর আলুপা রাজা কুন্দবর্মা আলুপেন্দ্র-২ মঙ্গলে দেবীর নামে যে মন্দির নির্মাণ করেন, পরবর্তীকালে তা মঙ্গলাদেবীর মন্দির নামে প্রসিদ্ধ হল।

আমাদের মঙ্গলা মন্দির দেখা হল না। বাসে করে চলে গেলাম স্টেট ব্যাঙ্ক সার্কেলের কাছে আরেক বাস টার্মিনাসে। এখানে সবই প্রায় প্রাইভেট বাস।

ভারতীকে বললাম — হাতে সময় আছে, উদুপী যাবে?

— হ্যাঁ, তাই চলো। একটা কিছু অন্তত দেখা হোক। ভারতী সম্মতি জানায়।

কণ্ডাক্টর হেল্পার সবাই ডাকাডাকি করছে। কিন্তু আমাদের হয়েছে সেই অবস্থা — আমি যে তোর ভাষা বুঝিনে।

তিনজনের কাছে প্র(ে করে উদুপীর বাস কিনা নিশ্চিন্ত হয়ে তবে একটি বাসে উঠে বসলুম। বাসভাড়া পঁচিশ টাকা।

শহর ছাড়িয়ে গু(পুর নদীর উপর কুল্লুর ব্রিজ পেরিয়ে বাস ১৭-নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে চলল উত্তরদিকে। আরব সাগরের হাতছানি বাঁদিকে রেখে। দশ কিলোমিটার উত্তরে প্যানাম্বুরে বসেছে ম্যাঙ্গালোরের নতুন বন্দর। ভারতের নবম গভীর সমুদ্র-বন্দর। কুদ্রেমুখ খনি থেকে আয়রন ওর রপ্তানীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। আছে স্টিল ফ্যাক্টরি, রিফাইনারি এবং কেমিকাল ফ্যাক্টরি। লাগোয়া সুরাটকলও সমুদ্র সৈকত। মুলকির কাছে বাপ্পানাদু শ্রীদুর্গাপরমে(রী মন্দির। সেদিন কোন উৎসব ছিল হয়তো। বেশ কয়েকজন যাত্রী নেমে গেল পূজো আর্চার জন্য।

পনেরো কিলোমিটার দূরে পড়ল পাদুবিদ্রি। বল্লাল নায়কদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান। দ(বেলির জন্য খ্যাতি আছে। মন্দির আছে। উদিপি, কারকালা এবং ম্যাঙ্গালোরের মিলনস্থল এই পাদুবিদ্রি।

পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে কফি-কাজুর শহর কারকালাতে আছে ১৪৩২ সালে নির্মিত চৌদ্দ মিটার উঁচু গোমতে(রের (বাহুবলী) একশিলা মূর্তি। ভেনুর, ধর্মস্থল, মুডাবিট্রি (মুদাবিদার) ইত্যাদি অন্যান্য জৈনতীর্থ। ম্যাঙ্গালোর থেকে উদুপী ৫৮ কিলোমিটার। আর কারকালা থেকে ৩২ কিলোমিটার। সমুদ্রতীরবর্তী জনপদ কাপু হয়ে উত্তরদিকে আমাদের গন্তব্যস্থল।

চিত্র-২। কৃষ(মন্দিরের প্রবেশদ্বার।

উদুপী কথার অর্থ তুলু ভাষায় চাঁদ। চন্দ্রমৌলে(রের মন্দির তারই স্মারক। উদুপী আবার রজথপীঠ নামেও পরিচিত।

বর্তমানে উদুপীর খ্যাতি বৈষ(বগু(মাধবাচার্যের জন্মস্থান হিসেবে। তাঁর জীবনকাল ১২৩৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৩১৭ পর্যন্ত। কার স্ট্রীটে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শ্রীকৃষ(মন্দির। শুধু মন্দির নয়, তিনি আটটি মঠও প্রতিষ্ঠা করে যান। তাই এর নাম হয় অষ্টমঠগলু। ঐ আট মঠের মূলকেন্দ্র রয়েছে উদুপীর মন্দির চত্বরে।

শঙ্করাচার্যের বিরোধী ও সমালোচক হিসেবে মধ্বাচার্য বা মাধবাচার্য দ্বৈতবাদের প্রবক্ত(া। তিনি বলেন, ব্রহ্ম ও জীবজগত নিত্য ভিন্ন। পাঁচ রকমের ভেদ আছে – জীব ও ঈ(রের

ভেদ, জড় ও ঈ(রের ভেদ, জীব ও জড় ভেদ, জীব ও জীবে ভেদ, জড় ও জড়ে ভেদ। মুক্ত(জীব ঈ(রের থেকে ভিন্ন, কিছুটা ব্রহ্মসদৃশ হতে পারে মাত্র। অবিদ্যাই বন্ধনের মূল কারণ। মুক্তি(র জন্য জ্ঞান ও বিদ্যার চেষ্টা দরকার। আর দরকার ধ্যান ও ভক্তি(। জ্ঞান ভক্তি(দাতা এবং ভক্তি(ধ্যানদাতা। ঈ(রভক্তি(ও ধ্যানে মো(লাভ হয়। তাঁর ক(ণা ভিন্ন মো(লাভ সম্ভব হয় না। ব্রহ্ম ও বিষ(ুই প্রধান আরাধ্য। 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' তাঁর একটি মূল্যবান গ্রন্থ।

বাস স্ট্যাণ্ড থেকে একটু পিছিয়ে এসে বাঁদিকের রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে পড়বে মন্দির চত্বর। ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেক মঠ ও মন্দির আছে গোটা চত্বরে। মধ্যমণি শ্রীকৃষ(মন্দির। মন্দিরের মাধবমূর্তিটি পাওয়া গিয়েছিল মালপের সুমদ্রতটে বোধভাণ্ডি(রের বিচে। তা নিয়েও এক কাহিনী আছে। কাহিনী ব্যতীত ধর্মস্থানের মাহাত্ম্য থাকে?

কৃষ(মন্দিরে দ্রষ্টব্য রূপোর দরজা এবং সোনায় মোড়া রথ। আছে মাধব সরোবর – মানুষের বি(াস প্রতি দশ বছর অন্তর গঙ্গা প্রবাহিত হয় এই সরোবরে। কী করে হয়, সে প্র(না তোলাই ভালো। বি(াসে কী না হয়! দু বছর পরপর জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হয় বিখ্যাত পারয়া মহোৎসব। তখন আট মঠের স্বামীজীদের মধ্যে পরিচালন (মতার হস্তান্তর হয়।

এমনিতে মন্দিরে অবারিত দ্বার। সেদিন কোন ধনীব্যক্তি(র বিশেষ পূজার্চনা ছিল বোধ হয়। ফলে প্যাসেজের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হল অনেকটা সময়। একটু এগিয়ে বাঁহাতে প্রবেশদ্বার। দেবভক্তি(তে দ(িণ ভারতীয়রা কি এগিয়ে? সকালসন্ধ্যায় মন্দিরে প্রণাম তাদের জীবনচর্চার অন্যতম অঙ্গ।

কৃষ(মন্দিরের বিখ্যাত কৃষ(মূর্তি দর্শন করলাম। কালো পাথরের ছোট মূর্তি। প্রদীপের অল্প আলোয় অপার্থিব। মন্দির ঘিরে আরো মণ্ডপ। আরো অনেক দেবদেবী আছেন মণ্ডপ ও চত্বরের নানাদিকে।

মন্দিরের সামনের মণ্ডপে বসে একজন গায়িকা গান গাইছেন। একপাশে হোমযজ্ঞ হচ্ছে। ঘৃতাহুতি দেওয়া হচ্ছে। বাতাস ভারী হয়ে রয়েছে তার সুবাসে। ভক্ত(রা দলেদলে এসে প্রণাম করছে। দেবতা দর্শন করছে। একদল বিশ্রাম নিচ্ছে মণ্ডপে বসে। বেরোনোর পথে প্রসাদ বিতরণের কাউন্টার। প্যাকেটে করে নানা মূল্যের প্রসাদম বিক্রি(হচ্ছে। এক প্যাকেট প্রসাদম কেনা হল চিরদীপের জন্য।

প্যাসেজের বাঁদিকে কৃষ(মন্দির আর ডানদিকে মাধব সরোবর। সামনে এগিয়ে আরো মন্দির। সেই ধনী ভক্ত(বৃন্দ এবার সদলবলে সমবেত হয়েছেন। বাদ্য বাজছে। মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে। সকলেই ব্যস্ত এবং দর্শনের জন্য উন্মুখ। এত ঠেলাঠেলি করে দেবতার দর্শনলাভ করা আমাদের মতো পাপী-তাপীর প(ে সম্ভব নয়। সুতরাং দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

মনে পড়ল এখানে বঙ্গদেশ থেকে শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩খৃঃ) এসেছিলেন। আসলে জগন্নাথধাম থেকে দ(িণ ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে উদুপী এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে পুরন্দর দাস ও কণকদাসরাও ছিল। মাধব-শিষ্য মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য হলেন ঈশ্বরপুরী। তাঁর কাছে শ্রীচৈতন্য মন্ত্র গ্রহণ করেছেন। সেই হিসেবে শ্রীচৈতন্যও মাধব সম্প্রদায়ভুক্ত(। তবে পুরোপুরি নন। তাঁর মতবাদ মাধব-মত থেকে একটু ভিন্ন বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন।

উদুপীর শ্রীকৃষ(মন্দির চত্বরে মাধবাচার্য সম্পর্কে একটি ইংরেজি বই চোখে পড়ল বটে তবে দোকানদার না থাকার জন্য কেনা গেল না। বাইরের চত্বরে বইয়ের দোকানে সবই কন্নড় ভাষায় লেখা বই। অন্য ভাষাভাষীদের জন্য এদের প্রকাশনার উদ্যোগ নেই কেন?

শুনেছি উদুপীর ইডলি-মশলাদোসাও বিখ্যাত। না, তার পরী(া করার সুযোগ হয়নি। চারদিকে দোকানপাট অনেক। সবই বেশ ঝা-চকচকে শপিং সেন্টার।

চার কিলোমিটার পশ্চিমে মালপে বন্দর ও সমুদ্রসৈকত। বোধভণ্ডি(র বীচ। সেখান থেকে মাধবাচার্য শ্রীকৃষ(মূর্তি পেয়েছিলেন। বিদানুরের বসপ্পা নায়ক এখানে ধামবচদুর্গদ নামে একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন।

মালপের কাছে নারকেল বীথিকায় ছাওয়া কয়েকটি পাথুরে দ্বীপ আছে। নাম সেন্ট মেরিজ আইল্যাণ্ড। ভাস্কো-দা-গামা এরই একটি দ্বীপে পদার্পণ করেছিলেন। দ্বীপভূমিতে ব্যাসল্ট পাথর ষড়ভুজাকার ত্রি(স্টালে পরিণত হয়েছে। এই ভর দুপুরে আমাদের প(ে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই মণিপালের বাসে চড়ে বসলুম।

মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরে মণিপাল। উদুপী থেকে মণিপাল পূর্বদিকে – বাসভাড়া পাঁচ টাকা।

পাহাড় জঙ্গল কেটে স্বনামধন্য ডাক্ত(ার টনসে মাধব অনন্ত পাই মনিপাল নামক জনপদ প্রতিষ্ঠা করেন। পেশায় ডাক্ত(ার হয়েও আত্মনিয়োগ করেছিলেন শি(া এবং ব্যাঙ্কিংয়ে। রোগীর সেবা করতে করতে তাঁর উপলব্ধি হয় যে নিচের তলার মানুষের উন্নতির জন্য কেবলমাত্র দানধ্যান করে বেশিদূর কাজ হবে না(দরকার শি(া এবং সেলফ-হেলপের মাধ্যমে বৈষয়িক উন্নতি। দিনে মাত্র চার আনা করে সঞ্চয় করা যাক – এই ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্কে চালু করলেন 'পিগমি ডিপজিট স্কিম'। ১৯৪২ সালে ম্যাট্রিক-ফেল ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করার উদ্দেশ্য নিয়ে গঠন করলেন অ্যাকাডেমি অব জেনারেল এডুকেশন। এভাবে তাঁর সামান্য থেকে অসামান্যে যাত্রা শু(। দু'দশকের ওপর তিনি ছিলেন সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান। আর একটি সাধারণ অ্যাকাডেমিকে ত্র(মে পরিণত করেছিলেন মহী(হে – ১২টি হাই স্কুল, ২টি কলেজ,

৬টি আর্ট কলেজ এবং ৬টি মেডিকাল-ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি প্রফেশনাল কলেজ নিয়ে নির্মাণ করেছেন এক বিশাল সাম্রাজ্য। এই কর্মোদ্যোগী মানুষটি একাশি বছর বয়সে ১৯৭৯ সালে মারা যান। পরে তাঁর ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ হয়েছে।

তাঁর মণিপাল এডুকেশন আরো বিস্তৃতি লাভ করেছে। বি(ের দরবারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অগ্রণী শি(া প্রতিষ্ঠান হিসেবে। এখানে রয়েছে নানাপ্রকার কলেজ প্রতিষ্ঠান – মেডিকাল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কত কী! ডিমড ইয়ুনিভার্সিটি পর্যন্ত। সত্যি এক বিশাল সাম্রাজ্যই বলা যায়। আমাদের শুধু মেডিকাল কলেজ চত্বরই দেখা হল। সবটা ঘুরে দেখা পায়ে হেঁটে সম্ভব নয়।

প্রথম দফায় মণিপাল ঘুরে গিয়ে চিন্ময় বলেছিল – মণিপাল প্রসিদ্ধ হয়েছে কেন আপনাকে তার উদাহরন দিই, বুঝবেন। সারা বছরের শি(াসূচী ছাত্রছাত্রীরা বছরের শু(তেই হাতে পেয়ে যাবে। পরী(া কবে, ছুটি কবে, কবে কোন ক্লাসে কোন শি(ক কি বিষয় নিয়ে পড়াবেন সমস্ত তথ্য তাতে থাকবে। কলেজের প্রশাসনিক কাজকর্ম হবে সাগ্রহে। দায়সারা কাজ নয়, বা দায়দায়িত্ব-কত-তাড়াতাড়ি-ঝেড়ে-ফেলা-যায় গোছের কর্মও নয়। ঘেরাও-হরতাল-রাজনীতির সুযোগ নেই। সেখানে অন্যত্র দেখুন, হরেক ব্যক্তি(ও নানা গোষ্ঠীর দাবীদাওয়া আদায়-বিদায় নিয়েই যতো চিন্তাভাবনা-কর্মকাণ্ড আবর্তিত। প্রতিষ্ঠানের মূল কর্মধারা এবং উদ্দেশ্য গোল্লায় গেল কি না, দেশ-রাজ্য-সমাজের কি হাল হল, তা দেখার দায় কারো নয়। উচ্চপদ থেকে নিম্নপদের সবটাতেই একই চিত্র। বিশেষ করে সরকারী ও আধা-সরকারী (েত্রে।

– শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গলের (েত্রে এরকম অবস্থা, তাও বোধ হয় ঠিক নয়। গোটা দেশে এরকমটাই চলছে। যেখানে চাকরি খোয়ানোর ভয়টা আছে, সেখানে রীতিনীতি অন্যরকম। নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা কেন যে মানুষকে কর্মবিমুখ ও দায়বদ্ধহীন করে! মানুষকে উদ্যোগী ও দায়বদ্ধ করে যেন লোভ, লাভালাভ ও নিরাপত্তাহীনতা।

ফেরার সময় সোজাসুজি ম্যাঙ্গালোরের বাস পেয়ে গেলুম। ট্রাভেল কোম্পানির বাস। ভাড়া নিল ছাব্বিশ টাকা।

বিকেলে ঘুরতে ঘুরতে পেয়ে গেলাম ম্যাঙ্গালোরের ট্যুরিস্ট অফিস। দেখা হল ফার্স্ট ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট জনৈক ধর্মপালের সঙ্গে। ইনি কর্ণাটক নর্থ-সার্কিট বিভাগের কর্মচারী। ভদ্রলোক অনেক তথ্য এবং পুস্তিকা দিয়ে সাহায্য করলেন আমাদের। আগ্রহভরে অনেক তথ্যও জানালেন।

ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে। খুঁজেপেতে অবশেষে চিরদীপের জন্য স্লটেট লোহার র‍্যাক পাওয়া গেল। র‍্যাক কিনে হোস্টেলে নিয়ে গেলাম অটো করে। কোথায় রাখা যায় এটা? বিছানার মাথার পাশে সেট করা হল। পরে অসুবিধা হলে তখন চিরদীপ যা ভালো

বুঝবে করবে। বইপত্র গুছিয়ে রাখা হল নতুন র‍্যাকে। ফেরার পথে নামল প্রবল বর্ষণ। এটাই ম্যাঙ্গালোরের বিশেষত্ব। দুমদাম বৃষ্টি।

ভিজতে ভিজতে হোটেলে ফিরলাম।

গোড়ায় কর্ণাটক বেড়ানোর পরিকল্পনা করা হয়েছিল এরকম। ৩রা আগস্ট রোববার রাতের বাসে ম্যাঙ্গালোর থেকে জোগ ফলস যাব। পরদিন বাদামী। আইহোল-পাট্টাডাকল-বাদামী দেখা হবে। ছয় তারিখে রওনা দেব হসপেট-হাম্পি। পরদিন হাম্পি দর্শন।

বর্ষার মরশুম বলে একটু দুশ্চিন্তা ছিল। এতদূর পর্যন্ত পরিকল্পনা সফল হলে ৭ই আগস্ট রাতে হাসানের উদ্দেশে রওনা দেব। দুদিন ধরে বেলুড়-হলেবিদ দেখব। তারপর ৯ই আগস্ট শনিবার রাতের মধ্যে ম্যাঙ্গালোর ফিরব। কেননা রোববার চিরদীপের সঙ্গে কাটাতে হবে। সন্দীপ্ত কোলকাতা থেকে সিকিম চলে যাবে ঐদিনই। আমরা কোলকাতায় নেই বলে এবার ওকে স্টেশনে গিয়ে বিদায় জানানো হবে না। কোলকাতা ফিরে হয়তো একবার ওর কাছেও যেতে হবে।

ম্যাঙ্গালোর থেকে কিছু বাস জোগ হয়ে গোয়ার দিকে যায়। শিমোগা-সাগর হয়ে। কারকালা-সোমে(ের-তীর্থহালি হয়ে শিমোগা ১৩৪ কিলোমিটার। সাগর আরো ৭২ কিলোমিটার দূরে। মুলকি-উদুপী-ভাটকল হয়েও সাগর যাওয়া যায়। সাগর থেকে তালগুপ্পা হয়ে জোগ একত্রিশ কিলোমিটার। সব মিলিয়ে ২৩৭ কিলোমিটার দূরত্ব। ট্রেনে চড়ে জোগ যেতে হলে ১৪৯ কিলোমিটার দূরের ভাটকল স্টেশনে নামতে হবে। ট্রেন আছে ম্যাঙ্গালোর-লোকমান্য মৎস্যগন্ধা এক্সপ্রেস। দুপুর ২-২০তে ছাড়ে। ভাটকল থেকে জোগ বা সাগর যাওয়া যায়। যোগে থাকার জায়গা — সরাবতী ট্যুরিস্ট হোম আর হোটেল ময়ূর গে(সোপ্পা।

পশ্চিমঘাট পর্বতমালার বুকে দেড় হাজার ফুট উঁচুতে জোগ ফলস। ভারতে উচ্চতম জলপ্রপাত। প্রায় ৯০০ ফুট উচ্চতা থেকে সরাবতী নদী নিচে পড়ছে চারটি ধারায়। রাজা ধারাটি সোজা নামছে। অর্ধেক পথ নেমে মিলিত হয়েছে রোরার সঙ্গে। তৃতীয় ধারার নাম রকেট। চতুর্থটির নাম রানী বা হোয়াইট লেডি। আরো দুটি ধারা আছে। খুব ইচ্ছে ছিল জোগ দেখে বাদামী যাওয়ার। এত অল্প সময়ে সবটা হয়ে উঠবে না বুঝে জোগ বাতিল করতে হল।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছে যে আমরা ম্যাঙ্গালোর থেকে সোজা বাদামী চলে যাব। জোগ ভ্রমণ-তালিকা থেকে বাদ। সবথেকে দূরের জায়গা বাদামী। শু(টা দূরদেশ থেকেই হবে। তারপর যাব হাম্পি যেখানে শেষ হিন্দুরাজারা রাজত্ব করে গিয়েছেন। বাদামী-আইহোলে দ(িণ ভারতীয় হিন্দু রাজাদের উত্থান হয়েছিল। কল্যাণীর চালুক্য রাজবংশ

এখানে রাজত্ব করে গিয়েছে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে। এদিকে হিন্দু রাজত্ব শেষ হয়ে যায় হাম্পির বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে। ৪৩৫ বছর আগে। বর্ষণ বিপুল বিঘ্ন না ঘটলে হাম্পির পর সাতশ' বছরের প্রাচীন বেলুড়-হলেবিদ মন্দির আরেকবার দেখা হবে।

ম্যাঙ্গালোরে এসে থেকে নানা সূত্রে নাথ সম্প্রদায়ের নাম শুনছি একাধিকবার। যতদূর জানা ছিল নাথধর্ম পূর্বভারতের ধর্ম। তা কর্ণাটকের উপকূলে পৌঁছল কী করে খোঁজ নিতে হয়! তন্ত্র, হঠযোগ, সহজিয়া, শৈবাচার, ধর্মপূজা ইত্যাকার নানা সংমিশ্রনে নাথ ধর্ম-বি(োসের উদ্ভব। বিশেষ করে হঠযোগ ও বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনার।

নাথধর্মে আদি পু(ষ হলেন স্বয়ং মহাদেব তথা আদিনাথ। তদর্থে এঁরা শৈব-যোগী। জানা গেল, তিব্বতের 'ত্যাঙ্গুর' গ্রন্থে চৌরাশী সিদ্ধার তালিকায় বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য এবং নাথ সিদ্ধাচার্যদের নাম আছে। পাঁচজন নাথগু(প্রসিদ্ধ। মীননাথ, পুত্র মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোর(নাথ বা গোর্খনাথ, জলন্ধরীপাদ (হাড়ি-পাদ) এবং কানুপাদ। মীননাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ অভিন্ন ব্যক্তি(ধরলে চারজন নাথগু(পাওয়া যায়। কেউ কেউ দাবী করেন মৎস্যেন্দ্রনাথ বাঙালি এবং বঙ্গদেশই তাঁর লীলাভূমি। আবার যোগী সম্প্রদায়ের বি(োস উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাঁর জন্ম। তাঁর রচিত পদসকল মিশ্র হিন্দিতেই পাওয়া গিয়েছে।

মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য ছিলেন গোর(নাথ। গোর্খা জাতিরও তিনি ইষ্টদেবতা। গোর(পুর তাঁর পীঠস্থান। ভর্তৃহরি ও জালন্ধর নামে তাঁর যে শিষ্য রয়েছেন তাঁরা অবাঙালি। 'গোর(বোধ' নাথ সম্প্রদায়ের গীতা। দশম থেকে দ্বাদশ শতকে এঁদের উদ্ভব হয়েছিল।

বলা হয়, নাথ এক পরমার্থিক অবস্থা। যোগের সাহায্যে ইন্দ্রিয় জয় করে নাথত্ব লাভ হয়। তখন তাঁরা প্রণব-তনুতে ইচ্ছাময় হয়ে বিচরণ করেন। যোগের গুহ্যতত্ত্ব জীবন্মুক্তি(র উপায়। বাংলায় 'মীনচেতন' বা 'গোর(বিজয়' নামে এক উপাখ্যান প্রচলিত আছে। গু(মীননাথ ও তাঁর শিষ্য গোর(নাথের কাহিনী। আছে বাংলার ধার্মিক রাজা মানিকচন্দ্রের নামে মানিকচন্দ্র রাজার গান। রাজার প্রধান রানি ময়নামতী গোরখনাথের শিষ্যা ছিলেন। বাংলার মহিষী হলেও আসলে তিনি উজ্জয়িনী-কন্যা। তাঁর নামেও প্রচলিত রয়েছে ময়নামতীর গান। নাথ ধর্মের প্রসার ভারতের নানা অঞ্চলে হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এমন কী সিংহলেও।

দীপিকার বান্ধবী পূর্ণিমা এখন ম্যাঙ্গালোরে রয়েছে। ওর কর্ম(েত্র লণ্ডন। শনিবার ওর বর রক্সি কন্যাদের নিয়ে দিল্লি চলে গিয়েছে লণ্ডন উড়ে যাবে বলে। একবার পূর্ণিমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ছিল। কৌতূহলও ছিল বটে।

এই সেই পূর্ণিমা যার ব্লাড ক্যান্সার হয়েছিল, যাকে রক্সি বিয়ে করেছিল মৃত্যুর সঙ্গে

সংগ্রামরত অবস্থায়। রক্সি ব্রাহ্মণসন্তান হয়েও ত্র(ীশ্চান মেয়েকে বিয়ে করার সৎসাহস দেখিয়েছিল। উডল্যাণ্ড থেকে মুম্বাই গিয়ে সে মেয়ে পরে রোগমুক্ত(হয়েছে। বিয়ে করে দুটি কন্যার জননীও হয়েছে। রক্সি চিকিৎসক, পূর্ণিমা গৃহবধূ। শারীর বৃত্তিয় কর্মে মানসিক শক্তি(র যদি কোন প্রভাব থাকে তবেই যেন পূর্ণিমার রোগমুক্ত(নবজীবনের ব্যাখ্যা মেলে।

রোববার সকালবেলা তিনজনে মিলে গেলাম পূর্ণিমাদের সঙ্গে দেখা করতে। চিরদীপের হোস্টেলের পিছনদিকেই ওদের বাড়ি। খেয়াল ছিল না যে রোববার ওদের চার্চে যাওয়ার দিন। এদিকে ফোনে বলা হয়ে গিয়েছে যে আমরা যাচ্ছি। এখন আর না গিয়ে উপায় নেই।

যাওয়ার পথে একখণ্ড বড়ো প্রান্তরের মধ্যে সুন্দর লাগল শান্তি চার্চটি। কেমন ঘরোয়া মনে নয়। চিরদীপের (মমেট বিজয়কে দেখা গেল চার্চের চত্বরে।

পূর্ণিমার বাড়ি শান্তি চার্চের কাছে। বাড়ির নাম মুলিইলি ভিলা। মুলিইলি ওদের পদবী। বাড়িতে মা-বাবা আছেন। বড়ো ভাই আছেন। বোনের নাম কল্পনা। ভাইবোনেরা মোটামুটি বাংলায় কথাবার্তা বলতে পারে। মা এসেও আলাপ করে গেলেন। একদা বিস্তর বিষয়-আশয় ছিল। ম্যাঙ্গালোরে বসবাস প্রায় সত্তর-আশি বছর হয়ে গেল। আসলে ওরা কেরালার লোক। ঠাকুর্দা মারা যাওয়ার পরে ওদিককার বিষয়-সম্পত্তি বিত্রি(করে ঠাকুমা চলে আসেন পিত্রালয় ম্যাঙ্গালোরে। সেই থেকে এখানে রয়েছেন।

জানার ইচ্ছে ছিল এরা ত্রি(শ্চান ধর্ম গ্রহণ করেছেন কোন সময়? এত সামান্য আলাপে সে প্র(্ন করার অবকাশ মেলেনি। কল্পনার বর অলউইন থাকেন মাদিকেরী। হোস্টেলে চিরদীপের লোকাল গার্জিয়ান উনিই। সেই সুবাদে কিছু কাগজপত্রে সইসাবুদের দরকার ছিল। সেসব করা হল। মাদিকেরীর গল্প হল একটু।

পশ্চিমঘাট পর্বতমালার কোলে পাহাড়ী বনাঞ্চল মাদিকেরী বা মারকারা ১৩৪ কিলোমিটার দূরে। মাত্র ১৫২৫ মিটার উঁচুতে। মাত্র সাড়ে তিন ঘন্টায় যাওয়া যায় ম্যাঙ্গালোর থেকে। ন্যাশনাল হাইওয়ে-৪৮ যাচ্ছে মহীশুরের দিকে। পথ গিয়েছে বান্তভল-পুত্তুর-জলসু(-সম্পাজি হয়ে মারকারা। অতীতের বীরভূমি কোডাগু বৃটিশদের মুখে হয় কুর্গ। এই অঞ্চলে অতিথিবৎসল কোডাবা সম্প্রদায়ের বাস। বত্রিশ কিলোমিটার দূরে ভাগামান্দালা — কাবেরী, কণিকা ও সুঁইয়োথি নদীর সঙ্গমে। আরো আট কিলোমিটার দূরে থালাকাবেরী — এখানকার কুণ্ড থেকে কাবেরীর জন্ম। বলা হয় এই কুণ্ড আসলে অগস্ত্য মুনির কমণ্ডলু।

ভারতী বলল — অগস্ত্য মুনি মানে সেই যিনি কথায় কথায় রেগে অভিশম্পাত দেন?

— না, তিনি দুর্বাসা। তবে এঁনারও উগ্রস্বভাব। এই অগস্ত্যমুনি সমুদ্র শোষণ করেছিলেন।

শুনেছি, দ(িণ ভারতের কা(্মীর এই মাদিকেরী। একবার গেলে হয়।

বেলুড় থেকে ফেরার সময় ঘুরে যাওয়া যায় বটে। সময়ে কুলোবে কিনা সন্দেহ।

বিকেল পাঁচটায় বাদামীর সরকারী বাস ছাড়ে। সারাদিনে একটিমাত্র বাস সোজা বাদামী যায়। দুরত্ব ৫০০ কিলোমিটারের কিছু বেশি হবে। আসলে একটু ঘুরে যায় বলে পথ কিছুটা বেশি। এখানকার লাল রঙের বাস মানে সাধারণ বাস — ভাড়া ২০৯ টাকা। রিজার্ভেশন নিয়ে পড়ল ২১৫ টাকা। পরে বুঝেছি রিজার্ভেশন না করলেও চলত।

চিরদীপ আমাদের বাসস্ট্যাণ্ড অবধি পৌঁছে দিয়ে হোস্টেলে ফিরে গেল।

আমরা ভিতরের সিমেন্ট বাধানো বেঞ্চিতে বসে আছি। যাত্রীদের জন্য বসার ব্যবস্থা যথেষ্ট। ঝলমলে রোদ বলে বাতাস একটু গরম। একজন উটকো লোক এসে জিজ্ঞেস করল — আপনারা ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছেন?

— না। মশাই, আপনার তা জেনে লাভ? রূঢ় স্বরে জবাব দিই।

লোকটি কাঁচুমাচু মুখ করে চুপ করে গেল। পরে মনে হল, এ বোধ হয় প্রাইভেট সংস্থার জন্য ব্যাঙ্গালোর-যাত্রী জোগাড় করে দেয়। তখন মনে হল — নাহ্, এতটা রূঢ় না হলেও চলত।

একটু পরেই বাদামীর বাস যাত্রী তুলতে নির্দিষ্ট স্লটে এসে দাঁড়িয়েছে। সংর(িত আসনে বসতে না বসতেই বাস ভরে গেল স্থানীয় মানুষজনে। কেজো মানুষদের ঘামের গন্ধ-মাখা সাদামাটা পোষাক-পরা শরীরে আমাদের মতো পর্যটকদের উদ্বৃত্ত স্নেহ নেই। এমন পরিবেশ কতটা অম্ল-মধুর ভাবতে না ভাবতেই বাস ছাড়ল। আরব সাগরের তটরেখা ধরে সোজা উত্তরাভিমুখে গতিমুখ।

আবার গু(পুর নদী পার হয়ে চলা। ১৭-নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে। উদুপী চলে গেল। ১১০ কিলোমিটার দূরে কুন্দপুর পার হয়ে এক সমুদ্রতট বাঁহাতে পেলাম। মারাভান্তে সি-বিচ। এত কাছে যে ভাবাই যায় না। সমুদ্রের উথাল পাথাল ঢেউ নিরন্তর তটের উপর আছড়ে পড়ছে। সামান্য বালুকাবেলা পার হলেই পৌঁছে যাওয়া যায় সেই শুভ্র ফেনারাশির কাছে। কাউপ পৌঁছল রাত সওয়া এগারটায়। ভাটকলের পর সরাবতী নদী পেরিয়ে হোনাভার।

কুমটা থেকে মনে হয় ডানদিকে ঘুরল বাস। মানে উত্তর-পূর্বদিকে। জাতীয় সড়ক-১৭ বাঁহাতে রেখে সিরসি নামক শহরের দিকে। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ভেদ করে চলা। বনাঞ্চল পথের দুধারে। সিরসি থেকে হুবলি কোন পথে পৌঁছল জানি না। অচৈতন্য হয়ে ঘুমিয়েছি। তবে বুঝতে পারছি রাস্তা তেমন মসৃণ নয়। দুপাশে জঙ্গল রয়েছে। জনবসতি বিরল ।

হুবলি থেকে ২১৮-নম্বর জাতীয় সড়ক চলে গিয়েছে বিজাপুর। আমরা সেই পথ ধরে দৌড়চ্ছি। নরগুন্ড কুলগেরি কে(র হয়ে ভোরবেলায় গদ্দনকেরি। এখান থেকে রাস্তা চলে গিয়েছে উত্তরে বিজাপুর। ডানদিকে ঘুরে চলেছি বগলকোট। সিমেন্ট কারখানার জন্য বিখ্যাত এই শহর।

তখন খুব ভোর। পথেঘাটে লোকজন নেই। চারদিকটা কেমন শুকনো রসকষহীন। একে তো বন্ধুর প্রকৃতি। তার উপর কলকারখানা উষর প্রকৃতির আনন্দ শুষে নিয়েছে যেন। বেশ কিছু লোকজন বগলকোট নেমে গেল। এরপর আমাদের গতিমুখ হল দ(ি ণ দিকে।

গন্তব্যস্থল বাদামী পৌঁছলাম যখন, তখন ঘড়িতে সওয়া সাতটা বেজেছে। একটানা সওয়া চৌদ্দ ঘন্টা বাস জার্নি করেছি। গোটা বাসে আমরা দু'জন বাদে আরেকজন মাত্র যাত্রী ছিল যে ম্যাঙ্গালোর থেকে বাদামী পর্যন্ত পুরোটা পথ ভ্রমণ করল। অন্য যাত্রীরা দলবেধে উঠেছে। কিছুদূর পর নেমে গিয়েছে। এরকম একটানা লম্বা সফর করেনি আর কোন যাত্রী।

তার মানে বাসে ছিল আমাদের নিয়ে তিনটি বদ্ধ উন্মাদ যারা সাধারণ বাসে ৫০০ কিলোমিটার রাস্তা সফর করল অক্লেশে।

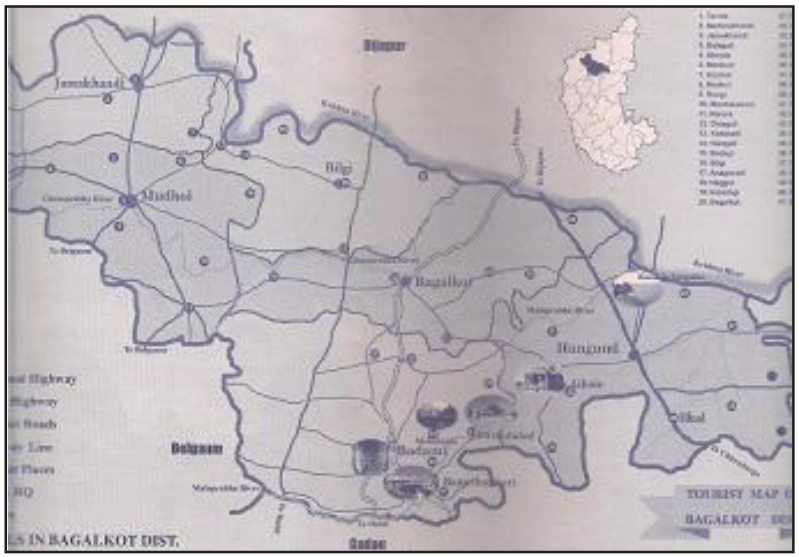

চিত্র-৩। উত্তর কর্নাটকের বগলকোট জেলা

৪। বাদামীর পথে

৪ঠা আগস্ট, সোমবার।

বাস থেকে নেমে প্রথম কাজ হল হোটেল ঠিক করা। আমরা বাসস্ট্যাণ্ডের কাছাকাছি থাকতে চাইছিলাম। খুঁজেপেতে আশ্রয় নিলাম হোটেল মুকাম্বিকায়। সঙ্গে ডিলাক্স কথাটি যুক্ত(করে অধুনা মানোন্নয়ন করা হয়েছে। ফোন নম্বর — ৬৫০৬৭।

সেক্সপীয়ার বলেছেন — 'নামে কি আসে-যায়? গুণেই পরিচয়।' কথাটা আজ আর পুরোপুরি খাটে না। নামে অনেক কিছু আসে যায়। শুধু নাম ও পদবী পছন্দ হচ্ছিল না বলে এক বিদূষী কন্যা একের পর এক পাত্র বাতিল করে যাচ্ছিল।

মুকাম্বিকা কথার সঠিক অর্থ জানি না। যা জানি তা হল, ইনি একজন দেবী। শিব ও শক্তি(র সমন্বয়ে রচিত জ্যোর্তিময় লিঙ্গস্বরূপ। কোল্লুরে এই দেবীর নিজস্ব মন্দির আছে।

মুকাম্বিকা ছাড়াও আশেপাশে দু'তিনটি হোটেল ছিল, যেমন আনন্দ লজ, সৎকার লজ। ভাড়া কম শ'দেড়েকের মধ্যে। তবু পছন্দ হল না। চৌদ্দ ঘন্টা বাসজার্নি করেছি। এসেই আবার বেড়িয়ে পড়তে হবে সাইট-সিয়িংয়ে। একটু স্বাচ্ছন্দ্য আশা করা খুব অনুচিত হবে না। মুকাম্বিকা ঘরভাড়া সাড়ে চারশ' থেকে কমিয়ে চারশ' করল।

হোটেলটি ভালো, বেশ ভালো। ঝা চকচকে বাথ(ম। স্লাইডিং দরজা ঠেলে বারান্দায় দাঁড়ালে ডানহাতে বাসস্ট্যাণ্ড চোখে পড়বে। সামনে বাড়িঘরের মাথা ছাড়িয়ে লালচে-বাদামী পাহাড়। গুহামন্দির ওই পাহাড়ে। বাঁহাতেও পাহাড়। হোটেলের লাগোয়া রেস্তোরা আছে। কয়েকজন বিদেশী-বিদেশিনীকে দেখা গেল।

বাদামীতে কর্ণাটক পর্যটন বিভাগের হোটেল আছে — হোটেল ময়ূর চালুক্য। অবস্থান একটু দূরে রামদুর্গা রোডে। অটো করে যেতে হবে। ঘরভাড়া একদা তো ছিল ১৯০ টাকা। বর্তমান রেট জানা নেই। বাসস্ট্যাণ্ডে ঢোকার মুখেও কিছু হোটেল দেখেছি।

বাদামী থেকে পাট্টাডাকাল ২৯ কিলোমিটার। পাট্টাডাকাল থেকে আইহোল ২৪ কিলোমিটার। ঘন্টায় ঘন্টায় পাট্টাডাকালের বাস মেলে। তথ্যসূত্রে জানানো হয়েছিল — বাদামী থেকে সকালে ছটা বা সওয়া আটটার বাসে দু'ঘন্টায় মধ্যে আইহোল দেখে দুপুর একটার বাসে পাট্টাডাকাল যাওয়া যায়। অনায়াসে পাট্টাডাকাল দেখে ঐদিন বাদামী ফিরে যাওয়া সম্ভব। মোটরে ঐ তিনটি জায়গা দেখতে খরচ পড়বে আটশ' টাকার মতো। কিন্তু পাঠককে জানিয়ে রাখি, এসব তথ্যে মোটেই ভরসা করবেন না। অন্তত যারা বাসে বাসে ঘুরবেন।

মহাভারতের বনপর্বে আছে যে ঋষি অগস্ত্য সূর্যের পথরোধকারী ঈর্ষাপরায়ণ বিন্ধ্যপর্বতকে নতশির হতে আদেশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন — যতদিন না দ(ি ণদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করছি, ততদিন এমনি নতশির হয়ে থাকতে হবে।

একথা বলে ঋষিবর দুর্লঙ্ঘ্য বিন্ধ্য অতিত্র(ম করে দা(ি ণাত্যে গমন করেন এবং সেদেশেই থেকে যান। আর কোনদিন ফেরেননি উত্তর ভারতে। বিন্ধ্যও উন্নতশির হতে পারেনি। সেই থেকে চালু হল অগস্ত্য যাত্রা কথাটি। মানে যে যাত্রা থেকে আর ফেরা নেই।

ব(ণ ও সূর্যর ঔরসে অপ্সরা উর্বশীর গর্ভে অগস্ত্যমুনির জন্ম। এ নামে একটি ন(ত্র আছে। শরত ঋতুর সূচনা করে অগস্ত্য ন(ত্রের উদয়। অগস্ত্যমুনির দা(ি ণাত্যে গমনের সঙ্গে সঙ্গে দ(ি ণদেশে শু(হয় আর্যসভ্যতার বিস্তার। তিনি কবে এই কর্ম করেছিলেন তা জানার উপায় নেই। বোধ হয় ভাদ্র মাসে করেছিলেন। তাঁর বিন্ধ্যপর্বত লঙ্ঘনও প্রতীকি ঘটনা। আর্যসভ্যতা বিস্তারে দ(ি ণী দ্রাবিড় সভ্যতা বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল বলে বিন্ধ্যপর্বতের মাথা তুলে দাঁড়ানোর কথা কল্পিত হয়েছে হয়তো।

হরপ্পা সভ্যতার সমকালে বা আগে এদেশে দ্রাবিড় সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল। দ্রাবিড় এবং অন্যান্য জনজাতিকে বেদ-পুরাণের যুগে অনার্য বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন দ(ি ণ ভারতের দ্রাবিড় জাতিও বহিরাগত। আফগানিস্থানের ব্রাহুই ভাষার সঙ্গে তার আশ্চর্য মিল দেখে ভাষাতাত্ত্বিক পুরাবিদরা এমনটা ভাবতে বসেছেন। এদেশের আদি বাসিন্দারা হয়তো কোল-ভিল-সাঁওতাল জাতীয় উপজাতিরা যাদের আমরা ট্রাইবাল বলি। প্রাগৈতিহাসিক স্তরের মানব-সভ্যতারও হদিশ মিলেছে অনেক। সেসব প্রাগৈতিহাসিক মানুষেরা কখন ইতিহাসের রাজ্যে প্রবেশ করল, কে বা কারা বহিরাগত হয়েও এদেশকে স্বদেশ করে নিল কে জানে!

অধিকাংশ পণ্ডিতের অভিমত আফ্রিকাই নাকি পশুজীবন থেকে মানবজীবনে উত্তীর্ণ হওয়ার লীলাভূমি। সেই কালো আফ্রিকা থেকে দফায় দফায় মানুষ ছড়িয়ে পড়েছিল শুধু ইউরোপে নয়, এশিয়ার নানা ভূখণ্ডেও। যেমন, চিনদেশে, ভারতে, চিন হয়ে আমেরিকায়, দ(ি ণপূর্ব এশিয়ায়, তারপর নানা দ্বীপপুঞ্জ হয়ে অস্ট্রেলিয়ায়। এরা বোধ হয় একটু থিতু হয়ে জাতি-উপজাতিতে পরিণত হয়েছিল। তবে স্থান থেকে স্থানান্তরে মানুষের গমনাগমন বহুকাল ধরে চলছিল। ইতিহাসের আগে এবং পরে।

দা(ি ণাত্য মানে সাতবাহন, বাকাটক, কদম্ব, চালুক্য, পল্লব, চোল, পাণ্ড্যদের দেশ। হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের দেশ। নিজাম-বাহমনি-বিজাপুর রাজ্যও বটে।

বাদামী সমুদ্রতল থেকে মাত্র ৫৮০ ফুট উচ্চতায়। এতটা কম উচ্চতায়? ঠিক

বি(্বাস হচ্ছে না। চার চারটে নদী বয়ে যাচ্ছে পশ্চিম প্রান্ত থেকে পূর্বতটের দিকে। দ(ি ণ প্রদেশসমূহ প-াবিত করে পতিত হচ্ছে বঙ্গোপসাগরে। চারদিকে (ক্ষ্ম ভূপ্রকৃতি এবং শুকনো জলহাওয়া। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার বৃষ্টিচ্ছায়ায় লালিত অঞ্চলটি মাঝেমধ্যে খরাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এবছরও খানিকটা তাই।

মৌর্যবংশই ভারতবর্ষের উত্তর-দ(ি ণে বিশাল এলাকা জুড়ে রাজ্যবিস্তার করেছিল সর্বপ্রথম। বিরাট একছত্র রাজ্য। নয়তো ভারতবর্ষ চিরকাল খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত(ছিল আর তারা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহেই ব্যস্ত ছিল। মৌর্যবংশের পতনের পরে দা(ি ণাত্যে সাতবাহন রাজারা রাজত্ব করে। তারপর মহারাষ্ট্র অঞ্চলে রাজত্ব করে বাকাটক বংশীয়রা। এর পরেই দ(ি ণে চালুক্য ও পল্লবরা শাসন (মতায় আসে। উত্তর ভারতে তখন গুপ্তরাজাদের কাল।

চতুর্থ শতক থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত চালুক্য রাজারা উত্তর কর্ণাটক অঞ্চলে সাম্রাজ্য স্থাপন করে রাজত্ব করেছিল। তারা কান্নাড়ী বংশজাত কি না তা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন চালুক্যরা রাজপুত — গুর্জর বংশোদ্ভূত, 'চাপ' নামের শাখা থেকে জাত। কেউ বলেন অযোধ্যার চন্দ্রবংশীয় রাজপুত। সোলাঙ্কী নামেও পরিচিতি আছে। বাতাপীর চালুক্যরা নিজেদের হরিতিপুত্র বলে দাবী করে। তাদের রাজধানীর নাম বাদামী।

ঋষি অগস্ত্যের দ্বারা নিহত এক অসুরের নাম ছিল বাতাপী। এখন যদি সেই বাতাপী থেকে চালুক্য রাজধানীর নাম হয় বাদামী, তবে চালুক্যরা অসুর বাতাপীর বংশধর বলে মনে হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে ঋষির অনুকম্পায় পুন(জ্জীবিত হয়ে বাতাপী ঋষি অগস্ত্যর ঘনিষ্ঠ সহচর হয়ে যান। এই বাতাপী হয়তো চালুক্যবংশীয় কেউ, যিনি ঋষিবরকে দা(ি ণাত্যে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছিল। মনে মনে ভাবছিলুম, এরকম একটা কিছু ভজঘট হয়েছে কোথাও।

এদেশে এসে চালুক্য রাজাদের গল্পটা না জানা থাকলে চলবে না। ভারতীকে জিজ্ঞাসা করলাম — বাতাপীর গল্পটা মনে আছে তো?

— একটু একটু মনে পড়ছে।

দণ্ডকারণ্যের মণিমতী পুরীতে ইল্বল ও বাতাপী নামে দুই দৈত্য ছিল। দু'ভাই ছিল প্রবল ব্রহ্মদ্বেষী। ইল্বল ব্রাহ্মণবেশে অন্য ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করত এবং মেষরূপী বাতাপীকে রন্ধন করে ব্রাহ্মণদের আহার করতে দিত। আহারান্তে ইল্বল উচ্চস্বরে 'বাতাপী বাতাপী' বলে ডাকলে বাতাপী ব্রাহ্মণদের উদর বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসত। ভোজন-তৃপ্ত ব্রাহ্মণটি অকালে মারা পড়ত। এভাবে অনেক ব্রাহ্মণ নিহত হয়েছে দৈত্য ইল্বল-বাতাপীর হাতে। একদিন ঋষি অগস্ত্যকেও নিমন্ত্রণ করে ইল্বল। বাতাপীকে রন্ধন করে আহার করানো হয়। কিন্তু ঋষির জঠরানলে জীর্ণ হয়ে যাওয়ার ইল্বলের ডাকে সাড়া

দিতে পারে না বাতাপী। এভাবে অনুজের মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ হয়ে ঋষিকে আক্রমণ করে বসল ইল্বল। তারপর যথারীতি মুনির ক্রোধানলে দগ্ধ হয়ে যায় দৈত্য ইল্বল।

ইতিহাসে তিন দফায় চালুক্যদের কাহিনী ছড়ানো – বাতাপীর চালুক্য, কল্যাণের চালুক্য এবং বেঙ্গির চালুক্য। এদের মধ্যে বাতাপীর চালুক্যই প্রাচীনতম।

কোন এক চালুক্যরাজার নাম ছিল বিজয়াদিত্য। তার পূর্বপুরুষ দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশে রাজত্ব করতেন। পরে তারা কৃষ্ণানদীর তীরে হিরণ্যরাষ্ট্র নামের অঞ্চল দখল করে। বিজয়াদিত্যর বাসভূমি ছিল সেই হিরণ্যরাষ্ট্র।

কোন কোন সূত্রে জয়সিংহ এবং রণরাগ নামে দুজন চালুক্য পূর্বপুরুষের নাম পাওয়া যায়। রণরাগের পরে বোধ হয় আবির্ভূত হন প্রথম পুলকেশী। তাঁর রাজত্বকাল নিয়ে গোলমাল আছে। তবু গরিষ্ঠ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে ৫৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম পুলকেশী স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করেন। তিনিই নাকি আট বছর পরে কোন একরাষ্ট্রকূট রাজার কাছে পরাস্ত হয়ে রাজধানী গড়েন বাদামীতে। কোন রাষ্ট্রকূট রাজার কাছে পরাজয় হয়েছিল তা জানা নেই। তাঁর পূর্বতন রাজধানী ছিল কি তবে আর্যপুর বা আইহোল?

এর পরে ৫৬৬ বা ৫৬৭ খৃষ্টাব্দে চালুক্যদের রাজা হন প্রথম কীর্তিবর্মন বা কিরীটবর্মন। ইনি একত্রিশ বছর রাজত্ব করেন। পরে সিংহাসনে বসেন তারই ভাই মঙ্গলেশা। রাজত্ব করেন ৬১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এ দুজনের কীর্তিগাথা এখনো নানা স্মারকে উজ্জ্বল।

চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন কীর্তিবর্মনের পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশী। বত্রিশ বছর ধরে রাজত্ব করেন। রবিকীর্তি নামের একজন জৈন কবির আইহোল প্রশস্তিতে দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজ্যবিস্তারের বর্ণনা আছে। তিনি দক্ষিণের কদম্ব এবং মহীশূরের গঙ্গ বংশীয় রাজাদের পরাস্ত করেন। পরাস্ত করেন পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মনকে। তাঁকে বেঙ্গি-প্রদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। পুলকেশীর ভাই বিষ্ণুবর্ধন বেঙ্গি-প্রদেশে চালুক্যবংশের এক শাখার প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয় পুলকেশী কাবেরী নদী অতিক্রম করে চোল, কেরল, পাণ্ড্য রাজাদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। তিনি কনৌজের হর্ষবর্ধনকেও পরাস্ত করেছিলেন। তাঁর সময়ে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করেন।

৬৪২ খৃষ্টাব্দে প্রথম নরসিংহ বর্মন মামল্ল (৬৩০-৬৮০খৃঃ) নামক পরাক্রান্ত পল্লবরাজার হাতে দ্বিতীয় পুলকেশীরপরাজয় হয়। একবার নয়, পরপর তিনবার। রাজধানী বাদামী দখলে চলে যায় পল্লবদের। হয়তো তখন চালুক্য-রাজধানী সরিয়ে নেওয়া হয় বিষ্ণুবর্ধনের ভাঙ্গি বা বেঙ্গি। সেখানকার চালুক্যরা ইতিহাসে বেঙ্গির চালুক্য নামে পরিচিত। পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পল্লবেরা ধ্বংস করে রাজধানী বাদামী। নরসিংহ বর্মনের

পক্ষে অনুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে এই বাদামীতে।

সাতবাহন বংশের পতনের পরে পল্লব রাজবংশ কাঞ্চী নগর কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৩৫০ খৃষ্টাব্দে। পারস্যের পক্ষে এবং দাক্ষিণাত্যের পল্লব অভিন্ন কিনা প্রশ্ন আছে। হতে পারে তারা উত্তর-মধ্য ভারতের বাকাটক বংশের শাখা। অথবা দাক্ষিণাত্যের কোন স্বাধীন জনগোষ্ঠী। বংশের প্রথম রাজার নাম ছিল শিবস্কন্দ বর্মন।

রাজা সিংহবিষ্ণুর (৫৭৫-৬০০ খৃঃ) সভাকবি ছিলেন কিরাতার্জুনীয়-রচয়িতা মহাকবি ভারবি। তাঁর আদি নাম দামোদর। পিতার নাম নারায়ণ স্বামী। কাঞ্চীর রাজপুত্র মহেন্দ্রবিক্রমের আশ্রিত ছিলেন কিছুকাল। পরে রাজা হন প্রথম মহেন্দ্রবর্মন। রাজত্বকাল ৫৮০ (বা ৬০০) থেকে ৬৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে পরাস্ত হয়ে বেঙ্গি প্রদেশ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয় তাঁর সুযোগ্য পুত্র প্রথম নরসিংহ বর্মন।

পল্লব বংশের পরবর্তী রাজারা হলেন পরমেশ্বর বর্মন, দ্বিতীয় নন্দীবর্মন ও দন্তিবর্মন এবং শেষ রাজা অপরাজিত। ৮৯১ খৃষ্টাব্দে চোল রাজা আদিত্যর হাতে পল্লব বংশের সমাপ্তি ঘটে।

চোলরা দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন জাতি। তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপল্লী ও পদুকোটাই অঞ্চল তাদের বাসভূমি ছিল। মেগাস্থিনিস ও অশোকের শিলালিপিতে এদের উল্লেখ রয়েছে। ইতিহাসে চোল রাজাদের রাজত্বকাল আনুমানিক ৮৬০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১২৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাদের পরে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে কাকতীয়, পাণ্ড্য ও হোয়সাল বংশ।

রাষ্ট্রকূট বংশ বোধ হয় কর্ণাটকের কানাড়ীভাষী জনজাতি ছিল। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি বাতাপীর চালুক্য রাজা দ্বিতীয় কীর্তিবর্মনের সমকালীন ছিলেন এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা দন্তিদুর্গর রাজত্বকাল। ৭৫৩ খৃষ্টাব্দ থেকে দুশ' কুড়ি বছর রাজত্ব ছিল এই বংশের। পরাস্ত হয় কল্যাণের চালুক্য বংশের হাতে। তাদের উদ্ভব হয় ঐ সময়ে। রাজত্ব চলেছিল ১১৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

বাতাপীর চালুক্য রাজাদের কথায় ফিরে যাই। দ্বিতীয় পুলকেশীর পরে তাদের কি হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। প্রথম বিক্রমাদিত্যের আমলে (৬৫৫-৬৮১খৃঃ) বাদামী আবার সেজে ওঠে চালুক্য রাজধানী রূপে। সম্ভবত ৬৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি শৈবধর্ম গ্রহণ করেন। রাজ্যেও শৈব উপাসনার জোয়ার আসে।

তার পরে রাজা হন বিনয়াদিত্য (৬৮১-৬৯৬খৃঃ), বিজয়াদিত্য সত্যাশ্রায়া (৬৯৬-৭৩৩খৃঃ) ও দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য (৭৩৩-৭৪৪খৃঃ)। বিজয়াদিত্যর আরেক পুত্র ভীম কল্যাণের চালুক্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। বাতাপীর শেষ রাজা ছিলেন দ্বিতীয় কীর্তিবর্মন (৭৪৪-৭৫৭খৃঃ)। তিনি রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তিদুর্গের নিকট পরাস্ত হন ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে।

এক রাজা যায়, অন্য রাজা আসে। কিন্তু রাজ্য থাকে, দেশ থাকে, প্রজা থাকে। বাদামীতেও কালে কালে শাসক বদলায়। আসে কল্যাণের চালুক্য, কলচুরি বংশ, দেবগিরির যাদব বংশ, বিজয়নগর, বিজাপুরের আদিলশাহী বংশ। তারপর মারাঠা ও বৃটিশ শক্তি(।

বাতাপী তথা বাদামীতে চালুক্যরাজ কিরীটবর্মন (কীর্তিবর্মন) ও তাঁর ভাই মঙ্গলেশা নির্মাণ করেন তিনটি ব্রাহ্মণ্য গুহামন্দির। লাল বেলেপাথরের পাহাড় কেটে। ভারতে গুহামন্দির নির্মাণের সূত্রপাত সম্রাট অশোকের আমলে। উত্তর ভারতে। কিছুকালের মধ্যে অজন্তা-ইলোরায় গুহামন্দির নির্মাণ শু(হয়। দ(িণ ভারতে পাথর কেটে বা পাথর গেঁথে মন্দির নির্মাণ নিয়ে পরী(া নিরী(ার কাল প্রধানত চালুক্যদের আমলে।

মোট পাঁচটি গুহামন্দির আছে বাদামীর পাহাড়ী চত্বরে। প্রকৃতির ভাণ্ডারে লালরঙের বেলেপাথর সহসা নজরে আসে না। এদিকে তো দেখছি সবই লালচে রঙের। মাটি পাথর সব। লৌহ ধাতুটির প্রভাবে নাকি এরকমটা হতে পারে। ঐ পাঁচটি গুহার মধ্যে চারটি খোদাই-করা গুহা এবং একটি প্রাকৃতিক নিয়মে উদ্ভূত। ভ্রমণকারীদের কাছে বাদামীর মুখ্য আকর্ষণ এই গুহামন্দির দেখার অভিজ্ঞতা।

আমাদের প্রথম দর্শনীয় জায়গা আইহোল। তারপর পাট্টাডাকাল। মতলব ছিল, দূরের জিনিস আগে দেখে, তারপর কাছের জিনিস দেখা। মানে বাদামী দেখা। যদি সেদিন বাদামী দেখা সম্ভব না হয়, তবে পরদিন সকালে দেখে নেওয়া যাবে। তারপর হসপেটের বাস ধরা যাবে। সকালে বাস থেকে নেমেই বাদামী বাসস্ট্যাণ্ডে খোঁজ নিয়েছিলাম। বাস ঘুমটি থেকে ওরা বলেছিল দশটা নাগাদ আইহোলের বাস ছাড়ে। হোটেল থেকেও বলেছিল একই কথা।

স্নান করে ব্রেকফাস্ট সেরে পৌনে দশটায় বাস টার্মিনাসে পৌঁছে জানা গেল — না, এখন আইহোল যাওয়ার কোন বাস নেই। তাহলে দশটার বাসটা? ভো-কাট্টা হয়ে গিয়েছে। মানে ওই বাসটা আর চালু নেই। আমাদের পাট্টাডাকাল যেতে হবে। ওখান থেকে আইহোলের বাস-অটো পাওয়া যাবে।

অগত্যা পাট্টাডাকালের বাসে চড়ে বসলুম।

প্রায় এক ঘন্টার পথ। ভাড়া সাড়ে আট টাকা। বগলকোটের রাস্তায় খানিকটা উত্তরদিকে গিয়ে তারপর মহাকূটা হয়ে ডানদিক ধরে পূর্বদিকে যেতে হয়। বাঁকুড়ার মতো লাল মাটির দেশ। এদিক ওদিকে ছড়িয়ে আছে পাহাড় আর টিলা। মধ্যে মধ্যে সমতলভূমি ও (ে ত-খামার।

পাট্টাডাকালে পৌঁছে জানতে পারি যে আইহোলির জন্য কোন বাস নেই। সকালের বাসটা চলে গিয়েছে। দ্বিতীয় বাস পাওয়া যাবে বিকেল চারটের সময়। দূর ছাই! এদের কথাবার্তার তো কোন মাথামুণ্ড নেই। এদিকে সময় বয়ে যাচ্ছে। ভারতী সচেতন করে

— কটা বাজে দেখেছ?

— তাই তো। বেলা হয়ে যাচ্ছে!

— ঠিক আছে, আইহোলি পরে হবে। আগে সামনে যা পাচ্ছি সেটা দেখে নেওয়া যাক।

এই ভাবনা যুক্তি(যুক্ত(মনে হল। আইহোলের আশা আপাতত স্থগিত রেখে আমরা গুটিগুটি সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। সবুজ গালিচায় সাজানো কয়েক শতাব্দী প্রাচীন এক ধ্বংসস্তূপের দিকে।

প্রায় তেরোশ' বছর পিছনে ফেলে।

চিত্র-৪। পাট্টাডাকাল মন্দির চত্বর।

৫। পাট্টাডাকাল

মিশরের গ্রীকমনিষী ক্লডিয়াস টলেমাউস টলেমি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মানুষ। তিনি যে পৃথিবীর মানচিত্র আঁকেন, তাতে পেটিরগাল নামের এক জায়গার উল্লেখ করেছিলেন। সেই পেটিরগাল আজকের পাট্টাডাকাল নয়তো? অতীতে এর নাম ছিল রত্ত(পুর। কানাড়া ভাষায় অতীতে এই স্থানের আরেক নাম ছিল 'কিসুভোলাল'। 'কিসু' মানে লাল আর 'ভোলাল' মানে উপত্যকা-নগর। লালমাটি-পাথরের জন্য এরকম নাম হয়ে থাকলে, অবশ্যই তা যথাযথ হয়েছে। পাট্টাডাকাল নামের মধ্যে পাট্টা শব্দটা আছে। পাট্টা জমিজমা সংত্র(ান্ত বিষয়। গোটা শব্দের অর্থ কী হতে পারে কে জানে!

কৃষ(া নদীর শাখা উত্তরবাহিনী মালপ্রভা নদী। তার বাম তীরে পাট্টাডাকালের অবস্থান। ৫৮০ ফুট উচ্চতায়। ভারতে যে সকল ঐতিহাসিক কেন্দ্র ইউনেস্কো দ্বারা 'ওয়ার্লড হেরিটেজ সেন্টার' হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে, তার মধ্যে পাট্টাডাকাল অন্যতম। এ তথ্য এখানে এসেই জানা হল।

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে রেখেছে এলাকাটি। আগে এখানে কয়েক ঘর পরিবার বসবাস করত। তারা যথানিয়মে ধ্বংস করেছে দেশের ঐতিহাসিক সম্পদ। এ কাজটা আমাদের দেশবাসী যত্নসহকারে সম্পন্ন করে থাকে। বছর ত্রিশ আগে তাদের সরিয়ে এলাকাটি বসতিমুক্ত(করা হয়েছে। সাজিয়ে গুছিয়ে তোলা হয়েছে পর্যটক-দর্শকদের জন্য, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব চর্চার জন্য। মানবেতিহাসের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন থাকার প্রয়াসে।

প্রবেশমূল্য জনপ্রতি দশ টাকা। অন্য সবজায়গায় পাঁচ টাকা করে। গাইড অশোক বাডিগের বেশ গর্বের সঙ্গে সেকথা জানিয়েছিল আমাদের।

পাট্টাডাকাল চালুক্য রাজাদের দ্বিতীয় রাজধানী ছিল সপ্তম থেকে নবম শতক পর্যন্ত। প্রথম তথা প্রধান রাজধানী বাদামী বা আইহোল। পাট্টাডাকালে রাজাদের অভিষেক এবং অন্যান্য রাজকীয় উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হত। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিত্র(মাদিত্য এবং তাঁর শিল্পরসিকা দুই রানি লোকমহাদেবী ও ত্রৈলোক্যমহাদেবী কাঞ্চীপুরম থেকে স্থপতি এনে প্রস্তরে একাধিক স্বপ্নমন্দির রচনা করেন। অবশ্য তারও আগে থেকে এখানে নানা মন্দির ছিল।

সাধারণত এরকমটা দেখা যায় না যে অভিষেক ও উৎসবের জন্য রাজারা একটি বিশেষ রাজধানী স্থাপন করেছেন। তবে বলতে পারেন, রাজারাজড়াদের

ব্যাপারই আলাদা।

এখানে কোন রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়নি। প্রাচীনকালের জনবসতির চিহ্(মাত্র নেই। আছে চালুক্য স্থাপত্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে দশটি মন্দির। আটটি মন্দির সংর(িত এলাকার মধ্যে। অন্য দুটি মন্দির, পাপানাথ এবং জৈন মন্দির, অদূরে গ্রামের মধ্যে। দশটির মধ্যে চারটি মন্দির উত্তর ভারতের নাগর শৈলীতে গড়া। ছ'টি দ(িণ ভারতের দ্রাবিড় শৈলীতে।

ভারতী বলল — নাগর-রীতি দ্রাবিড়-রীতি এককালে পড়েছিলাম। কিচ্ছু মনে নেই আর।

যতটা বুঝেছি তা এরকম। নাগর রীতির মন্দির পরিকল্পনায় ভিত থেকে চূড়ো পর্যন্ত কাঠামো হয় সমচতুষ্কোন আকারের। দেয়ালের উপরকার আচ্ছাদন প্রলম্ব শিখরের আকৃতি বিশিষ্ট। শিখরের ওপরের দিকটা ত্র(মহ্রাসমান এবং বাইরের রেখা অন্তর্বর্তুল। মস্তকে গোলাকার আমলক-শিলা, কলস এবং ধ্বজা থাকে। এটি উত্তর ও মধ্য ভারতীয় মন্দির নির্মাণশৈলী।

দ্রাবিড় রীতির মন্দির আকারে সমচতুষ্কোণ হলেও উপরের আচ্ছাদন পিরামিডের মতো — ত্র(মহ্রাসমান কয়েকটি তলে বিস্তৃত থাকে। মস্তকে বসানো স্তূপী নামক গম্বুজাকৃতি শিলাখণ্ড। এ রীতি প্রধানত দ(িণ ভারতে সীমাবদ্ধ। নাগর রীতির মন্দির-শীর্ষের গ্রীবা-শিখর চতুষ্কোন আকারের আর দ্রাবিড়-রীতি (ে ত্রে তা ষড়ভুজাকার বা অষ্টভুজাকার। কোন কোন নক্সায়, অধিষ্ঠান থেকে শীর্ষদেশ অথবা শুধুমাত্র গ্রীবা-শিখর গোলাকার বা উপবৃত্তাকার বা গজপৃষ্ঠের মতো। একে বেসর-রীতির মন্দির বলে।

ভারতীকে এমনটা বোঝালুম বটে, তবে আমিও নিশ্চিত নই, সবকথা ঠিকঠাক বলা হল কিনা। পরে ভালো করে জানতে হবে। আপাতত ওকে সামলানো গেল। এবং নিজেকেও।

মন্দির দেবার্চনার জায়গা। উপাস্য দেবতার ক(ই গর্ভগৃহ। সেখানে বেদী বা কুলুঙ্গিতে থাকে দেবতার বিগ্রহ। গর্ভগৃহ ঘিরে প্রদ(িণ পথ থাকতে পারে। যদি থাকে তবে তা সান্ধার মন্দির, না থাকলে নিরান্ধার। গর্ভগৃহের সামনে পূজার্থীদের বসার জন্য ছাদওয়ালা সভাক(বা মণ্ডপ থাকে। উড়িষ্যায় একে জগমোহন বলা হয়। মণ্ডপ চারদিক খোলা হতে পারে যেমন মুক্ত(-মণ্ডপে হয়ে থাকে। অথবা আবদ্ধ-মণ্ডপে ঘেরা হতে পারে।

মন্দির নির্মাণ রীতি ত্র(মশ যখন উন্নত ও জটিল হতে শু(করল, মূলমন্দিরের সঙ্গে যুক্ত(হতে শু(করল আরো কামরা। গর্ভগৃহের সামনের জায়গা ঘিরে রাখা হল দেবতাকে দর্শনার্থীদের আড়ালে রাখার জন্য। মণ্ডপ ও গর্ভগৃহের মাঝখানের এই জায়গাটিকে বলা

হল অন্তরাল (ভেস্টিবিউল) বা অর্ধমণ্ডপ। কখনো মণ্ডপের সঙ্গে যুক্ত(হয়ে থাকে পার্শ্বমন্দির কিংবা অলিন্দ (পোর্চ)। আলাদা করে প্রবেশদ্বার-যুক্ত(মণ্ডপ তৈরী হল — নাম হল মুখমণ্ডপ। ক্র(মে আরো মণ্ডপ যুক্ত(হতে থাকল — যেমন, নাট-মণ্ডপ, ভোগ-মণ্ডপ, বিবাহ-মণ্ডপ ইত্যাদি। কিছু মণ্ডপ বসানো হল গর্ভগৃহের সঙ্গে একই অ(রেখায়, কিছু সমান্তরাল অ(। এসব কথা আমাদের বুঝিয়েছিল গাইড অশোক।

মন্দিরের বাস্তু-নক্সা (প্-্যান) সম্পর্কে আমাদের আরো কিছু জানা দরকার। চার দেয়াল দিয়ে ঘেরা খাঁজ-না-করা সরল চতুষ্কোন মন্দির হলে, তা একরথ মন্দির হত। আকর্ষণীয় করে তুলতে মন্দিরের বাইরের চার দেয়াল সোজা না রেখে ভেঙে খাঁজ-কাটা করা হল। প্রতিটি কোনার দিকে খাঁজ যুক্ত(করা হবে একেবারে নিচের ভিত থেকে উপর অবধি। যদি প্রত্যেক কোনায় এমন একটি করে খাঁজ (কর্ণরথ বা কোনাপাগ) যুক্ত(হয় তাহলে প্রত্যেক দেয়ালে দুটি করে খাঁজ কিংবা তিনটি করে রথ (দুটি কর্ণরথ ও একটি ভদ্ররথ বা রাহাপাগ) পাওয়া যাবে। তখন তাকে বলা হবে ত্রিরথ নক্সার মন্দির। যদি প্রত্যেক কোনায় দুটি করে খাঁজ (কর্ণরথ ও প্রতিরথ বা অনুরথপাগ) যুক্ত(হয়, তখন প্রত্যেক দেয়ালে চারটি করে খাঁজ কিংবা পাঁচটি করে রথ (দুটি কর্ণরথ, দুটি প্রতিরথ ও একটি ভদ্ররথ) আসে। এর নাম পঞ্চরথ নক্সার মন্দির। উড়িষ্যায় পঞ্চরথ নক্সার মন্দির অঢেল।

মন্দিরের বাইরের দেয়াল কয়েক খণ্ডে (স্প্যান) আগুপিছু করেও আরেক রকমের খাঁজ তৈরা করা যায়। দ(ণ ভারতে এর নাম ভদ্র। দুকোনায় দুটি এগিয়ে-আসা খণ্ড এবং মাঝে একটি পিছিয়ে-যাওয়া খণ্ড বানিয়ে তিন ভদ্রের গঠন হল। পঞ্চভদ্র দেয়ালে দুকোনায় এবং মাঝখানে এগিয়ে-আসা খণ্ড এবং অন্তবর্তী দেয়ালে পিছিয়ে-যাওয়া খণ্ড দেখা যাবে।

নির্মাণের উপকরণ হতে পারে কাঠ, ইট এবং পাথর। কাঠের নির্মাণ বেশিদিন টেকে না। ঐতিহাসিক প্রাচীন যা কিছু নিদর্শন পাথর বা ইটের তৈরী বলেই টিকে আছে। তারও মধ্যে পাথরের মন্দিরের আয়ু বেশি।

যে কোন নির্মাণের গোড়াপত্তন বলে একটা কথা আছে। মন্দিরের বেলায়ও আছে। মন্দিরের ভিতকে অধিষ্ঠান বা পীঠ বলা হয়। কখনো পীঠের নিচে থাকে উপান বা উপ-পীঠ। পীঠের উপর মন্দির ক(র কাঠামো (বাড় বা হর্ম্য) দণ্ডায়মান। বাড়ের উচ্চতা তিন বা পাঁচভাগে বিভক্ত(হতে পারে। উড়িষ্যা রীতি অনুসারে তিন ভাগ। তারা হল — পাভাগ, জঙ্ঘা ও বরণ্ডি (বারান্দা)। আর পাঁচভাগ হলে পাভাগ, তলজঙ্ঘা, বন্ধন, উপরজঙ্ঘা ও বরণ্ডি। বাড়ের উপরদিকে শিখর তথা গণ্ডী ও মস্তক। মস্তকে বসানো হয় বেঁকি, ঘণ্টা বা শ্রী, আমলক, খাপুরি, কলস ও ধ্বজা। দ্রাবিড় রীতি অনুসারে

একতলা মন্দিরের হর্ম্যদেশে ষষ্ঠ অঙ্গ বা বর্গ ল(্য করা যাবে, যেমন — নিচের দিকে অধিষ্ঠান ও পাদ, উপরের দিকে প্রস্তর বা কপোত (বরণ্ডি), গ্রীবা, শিখর (স্তূপী), কলস ও ধ্বজা। বহুতল মন্দির-বিমানের উপরতলে হর্ম্য ও প্রস্তর (কপোত) যুক্ত(হতে থাকে।

মন্দিরক(র আচ্ছাদন সমতল অথবা চালার মতো ঢালু হতে পারে। আবার শিখরচূড়া উর্দ্ধাকাশে উঠে যেতে পারে। গর্ভগৃহের উপরকার শিখরের অন্য নাম বিমান। পরে অবশ্য শিখরসহ সমগ্র গর্ভগৃহটিকেই বিমান বলা হতে থাকে। মন্দিরের শীর্ষে উঁচু উঁচু শিখর নির্মিত হয়, অধিষ্ঠিত দেবতার গৌরব ঘোষণা করতে। মণ্ডপের উপরেও শিখর থাকতে বাধা নেই। তবে মূল শিখরকে তা অতিক্র(ম করে না। বিমান বা শিখর নানা ধরনের হতে পারে।

উত্তর ভারতে দেখা যায় বঙ্কিম শিখর-দেউল (রেখদেউল), পীড়াদেউল, কাঁখরদেউল এবং বাংলার চালাঘরের অনুকরণে নির্মিত গৌড়ীয় দেউলের শিখর। কোণার্ক-পুরীর মূলমন্দিরের শিখর বঙ্কিম রেখদেউল রীতিতে গড়া। পীড়াদেউল দেখা যায় মূলমন্দির সংলগ্ন মণ্ডপে বা জগমোহনে। আবার বুদ্ধগয়ার মন্দিরশিখর সরল রেখদেউল রীতিতে নির্মিত। দ(ণ ভারতের দ্রাবিড় রীতির মন্দিরশিখর হয় পিরামিডের মতো। কয়েকটি ক্র(মহ্রাসমান তলে সংযুক্ত(পীড়াদেউলে। শিখর ধাপে ধাপে হ্রস্ব হয়ে উঠে যায় শীর্ষদেশের গ্রীবায়, স্তূপীতে ও কলসে। এর কোন পৃথক নাম আছে কিনা জানি না। আমরা একে তল-দেউল বলতে পারি।

টিকিট কেটে সংর(িত এলাকায় প্রবেশ করলাম। সামনে ছোটখাট একটি মন্দির

চিত্র-৫। কাদাসিদ্ধে(শ্বর মন্দির।

পেলাম — নাম কাদা-সিদ্ধে(শ্বর। তার পাশে জম্বুলিঙ্গ বা জম্বুলিঙ্গে(শ্বর মন্দির। জম্বুলিঙ্গ মন্দিরের সামনের দিকে গলগনাথ ও চন্দ্রশেখর মন্দির। কাদা-সিদ্ধে(শ্বর ও জম্বুলিঙ্গ মন্দিরের চূড়োয় এখন আর কোন মুকুট নেই। গলগনাথের শীর্ষদেশ অটুট। তারপর সঙ্গমে(শ্বর, কাশী বি(শ্বে(শ্বর ও মল্লিকার্জুন। দ(ণতম প্রান্তে বিরূপা(মন্দির।

কলিঙ্গ পীড়াদেউলের মতো ধাপে ধাপে পিরামিডের মতো উঁচু-

হয়ে ওঠা শিখর দেখা যাচ্ছে সঙ্গমেশ্বর, বিরূপা(ও মল্লিকার্জুন মন্দিরে। ত্র(মোন্বয়ে শিখর হ্রস্বতর হয়ে উঠে গিয়েছে আকাশের দিকে। গ্রীবা-শিখর বহুভুজাকার — দ্রাবিড় রীতি অনুসারে। জৈন মন্দিরও অনুরূপ শৈলীর।

কাদা-সিদ্ধেশ্বর, গলগনাথ, জম্বুলিঙ্গ, পাপানাথ এবং কাশীবিশ্বেশ্বর মন্দিরের শিখর রেখদেউলে রীতির। বর্গাকার মন্দির। জঙ্ঘার উপরে গণ্ডী বাঁক নিয়ে চূড়োর মতো উঁচুতে উঠেছে। গ্রীবায় আমলক ও কলস। নাগর রীতি অনুসারে। চন্দ্রশেখর মন্দির সম্পর্কে কিছু বলা চলে না। চার দেয়ালে ঘেরা গর্ভগৃহ ছাড়া তার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

যেতে যেতে অশোক বাডিগের বলছিল — নাগর রীতির প্রধান মন্দির হল এই জম্বুলিঙ্গেশ্বর। এই মন্দির তৈরীর আগে ছোট আকারের কাদা-সিদ্ধেশ্বর নির্মিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য নাকি নির্মাণ-শৈলী রপ্ত করা। একই কারণে গলগনাথ মন্দির নির্মাণ করার আগে চন্দ্রশেখর মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল। তেমনি বিরূপা(-মল্লিকার্জুন গড়ার আগে দ্রাবিড় রীতির রূপ রচনায় সঙ্গমেশ্বর মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে।

সবই শিবের মন্দির। শিবলিঙ্গ দেবতার প্রতিভূ হিসেবে উপাসিত। কিছু কিছু মন্দিরে আজকাল পূজার্চনা হয়।

প্রস্তরনির্মিত কাদা-সিদ্ধেশ্বর এবং জম্বুলিঙ্গ মন্দিরে টিকে রয়েছে কেবল গর্ভগৃহ এবং মণ্ডপ। শিখর রেখদেউলে সজ্জিত। বর্তমানে ভগ্নশীর্ষ। মাঝের কুলুঙ্গিতে মূর্তি আছে।

কাদা-সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের সামনে শৈব দ্বারপাল দুদিকে। গর্ভগৃহের তিনদিকের কুলুঙ্গিতে তিন মূর্তিআছে। উত্তরে দ্বিভুজ অর্ধনারীশ্বর — এক হাত দিয়েছে ষাঁড়ের মাথায় অন্য হাতে আধফোটা পদ্মফুল। পায়ের কাছে বামনমূর্তি। দারুণ সুন্দর ভাস্কর্য। পশ্চিমে হরিহর

চিত্র-৬। কাদা সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের সম্মুখভাগ।

দণ্ডায়মান। উত্তরে শিব। গর্ভগৃহের দ্বারদেশে সুন্দর ভাস্কর্য আছে উদ্বাহু শিবের। তাঁর এক হাতে সাপ অন্য হাতে ত্রিশূল। পাশে পার্বতী। ললাটবিম্বের এক প্রান্তে ব্রহ্মা অন্যপ্রান্তে বিষু(। দ্বারের নিচে নদী-দেবী গঙ্গা-যমুনার মূর্তি। শিখর ত্রিরথ নক্সার।

জম্বুলিঙ্গ মন্দিরের নির্মাতা বিজয়াদিত্যর মাতা বিনয়াবতী। ইনি যদি ৬৯৯ খৃষ্টাব্দে জম্বুলিঙ্গ নির্মাণ

করে থাকেন, তবে কাদা-সিদ্ধেশ্বর নিশ্চয়ই আরো আগের। জম্বুলিঙ্গমন্দিরের রেখনাগর শিখরদেশ কাদা-সিদ্ধেশ্বরের তুলনায় খাটো এবং একটু ভারির দিকে মনে হল। নন্দী আর পার্বতীকে নিয়ে নটরাজ শিবের দিব্যমূর্তি আছে শিখরের উপরকার ভাস্কর্যে। গর্ভগৃহের তিনদিকের দেয়ালে দ(ণে লাকুলিশ (লাকুলা নামের শৈব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা), পশ্চিমে সূর্য এবং উত্তরে বিষ(ুর মূর্তি আছে। মন্দিরের সামনে নন্দী মণ্ডপের অধিষ্ঠানমাত্র রয়েছে। পূর্বমুখী মন্দির।

চিত্র-৭। জম্বুলিঙ্গ ও কাদাসিদ্ধেশ্বর মন্দির।

অদূরে গলগনাথ মন্দির। অষ্টম শতকের গোড়ায় নির্মিত। মন্দিরের গর্ভগৃহে শিবের আসন। ত্রিরথ মন্দির-

চিত্র- ৮। জম্বুলিঙ্গ মন্দির।

শিখর চতুস্তল। চারকোনার প্রত্যেক তলে রয়েছে কোনাওয়ালা আমলক। তার নিচে চৈত্য-গবা(। বঙ্কিম রেখায় উপরে উঠে শিখর বিমান কেন্দ্রীভূত হয়েছে চতুষ্কোণ পীঠে। তার উপর কুম্ভাকৃতি শীর্ষ এবং ছোট কলস দেখতে পাচ্ছি। সামনের দিকে শুকনাসিকা ছিল মনে হয়। গর্ভগৃহের তিনদিকে প্রদ(ণ পথ গোছের কিছু আছে। সান্ধার প্রদ(ণ-পথ বলে একে। তার মাথার উপর ঢালু পাথুরে ছাদ এক ব্যতিত্র(মী গঠন। মন্দিরের সামনের অংশটা নেই। সেখানে একদা মুখমণ্ডপ ও সভামণ্ডপ ছিল। বর্তমানে কেবল জগতী রয়েছে। ফলে গর্ভগৃহের দু'পাশের প্রদ(ণ পথের কিছুটা করে বর্তমান। অতীতে দ(ণ পশ্চিম এবং উত্তরে একটি করে গণ-দ্বার ছিল। বর্তমানে দ(ণদিকে দুটি স্তম্ভের উপর

চিত্র- ৯। জম্বুলিঙ্গ মন্দিরে মুখপট্টি।

চিত্র- ১০। গলগনাথ মন্দির।

ভর করে প্রবেশমুখটি মাত্র আছে। স্তম্ভদ্বয় নিচে-উপরে চতুষ্কোন আর মধ্যিখানে গোলাকার। চমৎকার কিছু ভাস্কর্য রয়েছে প্রাচীর গাত্রে। দ(িণ দ্বারে শিবঠাকুর অন্ধকাসুরকে বধ করতে উদ্যত হয়েছেন।

সামনের দিকটা ভেঙে যাওয়ায় গর্ভগৃহের প্রধান প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত(হয়ে পড়েছে। দ্বারের দুপাশের বাজুর নিচের দিকে ও মাথার উপরে ললাটবিম্বে সুন্দর মূর্তি আছে। গলগনাথের গঠনসৌকর্য থেকে মনে হয় জম্বুলিঙ্গের পরে এর নির্মাণ হয়েছে।

চিত্র- ১১। গলগনাথ মন্দিরের প্রদ(িণপথ।

কাশী বিশ্বেশ্বর ও চন্দ্রশেখর মন্দির তেমন আকর্ষণীয় মনে হল না।

গলগনাথ আর সঙ্গমেশ্বর মন্দিরের মাঝখানে চন্দ্রশেখর মন্দির। মণ্ডপ, অন্তরাল আর গর্ভগৃহ আছে সমতল ছাদের নিচে। কয়েক ধাপ সোপান রয়েছে মণ্ডপে প্রবেশের জন্য। সামনে নন্দীমণ্ডপ আছে। সেখানে নন্দী তখনও বর্তমান।

চিত্র- ১২। কাশী বিশ্বেশ্বর।

কাশী বিশ্বেশ্বর মন্দির সঙ্গমেশ্বর মন্দিরের দ(িণ-পশ্চিম কোনার দিকে। পাশে মল্লিকার্জুন মন্দির। মন্দিরটি অষ্টম শতকের শেষের দিকে নির্মিত। রেখ-নাগর শৈলীর। মুখমণ্ডপ, সভামণ্ডপ, অন্তরাল ও গর্ভগৃহ আছে। পৃথক অধিষ্ঠানে নন্দীমণ্ডপ। রেখনাগর শিখরে পাঁচটি ভূমি। শুকনাসিতে নাট্যশিবের মূর্তি। সভামণ্ডপে চারটি স্তম্ভ আছে। তিনটি স্তম্ভের মাথায় ঘটপল্লব এবং একটি স্তম্ভে আমলক। স্তম্ভের পদ্মবন্ধের চারদিকে দেবদেবীর কাহিনী গ্রথিত। কাশী বিশ্বেশ্বর

পঞ্চরথ মন্দির। বাঁকানো শিখর দেউল পঞ্চরথ রেখদেউল রীতির। রথচূড়ার শীর্ষদেশ ভগ্ন, আমলক-কলস নেই। অধিষ্ঠানের উপর জঙ্ঘার তিন ভাগ —পাভাগ, জঙ্ঘা ও বরণ্ডি — দেখা যাচ্ছে। মালপ্রভা নদী পাট্টাডাকালে কাশীর গঙ্গার মতো উত্তরবাহিনী। তাই মন্দিরটিকে দ(িণের কাশীবিশ্বেশ্বের বলা হচ্ছে।

পাট্টাডাকালে নির্মিত প্রাচীনতম দ্রাবিড় রীতির মন্দির হল সঙ্গমেশ্বর। নির্মাতা

চিত্র- ১৩। সঙ্গমেশ্বর মন্দির, ডাইনে গলগনাথ মন্দির।

চালুক্যরাজা বিজয়াদিত্য সত্যাশ্রায়া। তাই বুঝি পূর্বনাম ছিল বিজয়েশ্বর বা বিজেশ্বর বা বিজয়েওয়াড়া মন্দির। ৬৯৯ খৃষ্টাব্দে তৈরী হয়েছিল? নাকি ৭১০ খৃষ্টাব্দে? অবস্থান চন্দ্রশেখর মন্দিরের দ(িণে। দ্রাবিড় বিমান শৈলীর নিদর্শন এটি।

প্রাচীনতম বলেই মন্দিরের শীর্ষদেশে শুকনাসিকা ছিল না। বাদিগের অবশ্য বলছিল সুখনাশি। মন্দির-শিখরের গ্রীবা থেকে অর্ধমণ্ডপের উপরে শুকপাখির নাসিকার মতো ঠেলে বেরিয়ে-আসা প্রস্তরখণ্ড হল শুকনাসিকা।

মন্দিরের শিখর-নির্মাণে নাগর-চালুক্য রীতির পরিচয় মেলে। ভূমি থেকে শিখর পর্যন্ত এর আকৃতি চৌকোনা। উঁচু অধিষ্ঠানের উপর নির্মিত। নন্দীমণ্ডপ পৃথক। মন্দিরের সামনে সভামণ্ডপ ভারি চেহারার ষোলোটি স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান। তার তিনদিকে মুখমণ্ডপ। মন্দিরে ওঠার সোপান আছে। সভামণ্ডপের পরে অর্ধমণ্ডপ ও গর্ভগৃহ। সান্ধার প্রদ(িণপথ আছে। সভামণ্ডপ উন্মুক্ত(।

ত্রিতল বিমান। প্রথমতলে দুটি দেয়াল। দ্বিতলে উঠে গিয়েছে গর্ভগৃহের অন্তঃপ্রাচীর। ফলে বহিঃপ্রাচীর ঘিরে রেখেছে গর্ভগৃহের প্রদ(িণ-পথ ও অর্ধ-মণ্ডপ। তাতে উগ্র-

নরসিংহ নটরাজ ইত্যাদি মূর্তি উৎকীর্ণ।

মহামণ্ডপ নির্মিত হয়েছে ষোলোটি স্তম্ভের উপর। স্তম্ভের উপর লিপি আছে। একটি স্তম্ভ 'ছল্লেভ্য' নামের কোনো নারীর দানে নির্মিত বোধহয়। আরো তিনজনের নাম পাওয়া যায় – 'শ্রীবিদ্যাশিব', 'পেরগাদে পোলেয়াচ্ছি' এবং 'নির্বানাঙ্কারা পাকা'। অস্পষ্ট আরেক লিপি থেকে অনুমান – নিকটবর্তী মুণ্ডলি গ্রামের জনৈক ব্যক্তি(কোন ব্রহ্মবাদীকে মন্দিরের জন্য জমি দান করেছিলেন। আরেকটি কানাড়া লিপি থেকে জানা যায় যে ছাভুমদা-২ রাজার প্রধান রানি দেমলাদেবী এবং তাঁর পুত্র অছিদেব ১০৮৪ শকবর্ষে (১১৬২ খৃষ্টাব্দে) নতুন করে মন্দিরের দানপত্র পুনর্নবীকরণ করেন।

একই অধিষ্ঠানের উপর মণ্ডপের অবস্থান। এই প্রথম মহামণ্ডপের ভিতরকার দু' ধারে আরো দুটি পার্শ্বমন্দিরের (সাব-স্রাইন) সংযোজিত দেখলাম। মূলদেবতার সঙ্গে পার্শ্বদেবতার আরাধনা শু(হয়েছে তখন থেকে। সঙ্গমে(রে পার্শ্বদেবতারা হলেন দুর্গা ও গণপতি।

মহামণ্ডপের উত্তরদিকে চারদিক-খোলা থামওয়ালা অলিন্দ আছে। বাইরের দেয়ালে দেখতে পাচ্ছি এক একদিকে আগুপিছু করে গোটা পাঁচেক করে ভদ্র রয়েছে। নিচের অধিষ্ঠান থেকে জঙঘার উপরকার প্রস্তর (কপোতা) পর্যন্ত। ভদ্র-খণ্ডের কুলুঙ্গিতে নানা দেবদেবীর মূর্তি এখনো খানকয়েক করে টিকে আছে। উত্তর দেয়ালে ভূবরাহ, বিষু(ও শিব আছেন। পশ্চিমে শিব-ভৃঙ্গী এবং শিব-নন্দী। জঙঘার উপরকার বরণ্ডি-প্রস্তরে গম্বুজাকৃতি কর্ণকূট ও লম্বাটে পিপার মতো ভদ্রশালার সারি। দ্বিতলেও চার কোণায় চারটি কর্ণকূট। মাঝখানে ভদ্রশালা রয়েছে। তৃতীয় তলের মাঝামাঝি অংশে কেবল ভদ্রশালা। কোনার কর্ণকূট বাতিল হয়েছে। তার বদলে মূলদেবতার বাহন বা লাঞ্ছন চার কোনা দখল করেছে। শীর্ষগ্রীবা বর্গাকার। তার উপর শিখরমুণ্ডি ও কলস শোভা পাচ্ছে।

বর্তমানে সবই প্রায় ধ্বংসস্তূপ। স্তম্ভ নেই, নাটমন্দির নেই। আছে কেবল উঁচু চত্বর।

চিত্র- ১৪। নন্দী ও সঙ্গমে(রের মন্দির।

চিত্র- ১৫। বিরূপা(মন্দির।

আর সামনে বিষন্ন নন্দী।

পাট্টডাকালের প্রধান আকর্ষণ বৃহদাকার বিরূপা(মন্দির। নির্মাণকাল ৭৪০ খৃষ্টাব্দ। পল্লবদের সঙ্গে যুদ্ধজয়ের স্মারক হিসেবে কাঞ্চী থেকে স্থপতি এনে দ্বিতীয় বিত্র(মাদিত্যের প্রধান রানি লোকমহাদেবী অপরূপ এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। প্রাচীন নাম ছিল লোকে(রের। রানি লোকমহাদেবীর নামে। প্রধান উপাস্য দেবতা শিব – কালো পাথরের লিঙ্গমূর্তি।

চিত্র- ১৬। কৈলাস-উত্তোলন, বিরূপা(মন্দির।

প্রধান মণ্ডপ থেকে উত্তর, দ(িণ ও পূর্বদিকে প্রসারিত হয়েছে তিনটি মুখমণ্ডপ বা অলিন্দ।

দ(িণ-অলিন্দের সামনের স্তম্ভের উপর পূর্বমুখী অর্ধোৎকীর্ণ রিলিফে রাবণের কৈলাস পর্বত উত্তোলনের দৃশ্য আছে। দা(ণ সুন্দর। দশানন রাবণের কয়েকটি মুখ বোঝা যাচ্ছে। পনেরো-কুড়ি হাত দিয়ে কৈলাস পর্বত তুলে ধরেছেন। চারদিকে হুলুস্থুলু পড়ে গিয়েছে। শৈব-গণদের মধ্যে কেউ প্রস্তরখণ্ড নি(ে প করছে। কেউ তীরযোজনে উদ্যত। বানর নকুল, সাপ, বরাহ, সিংহ ও হরিণ ভয়ে ছুটোছুটি করছে। এমনকী, পার্বতী পর্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে শিবের হাত ধরে বসে আছেন। কেবল পরম নিশ্চিন্তে শিব পালঙ্কে বসে আছেন পা ঝুলিয়ে। আমাদের মনে হচ্ছিল যেন রাবণ পিছন করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আর অন্য পায়ের হাঁটুতে ভর। কিন্তু মুখ ও হাত থেকে তা মনে হচ্ছিল না।

পাশে দ(িণ দিকে মুখ করে গদা-হাতে দ্বারপাল অনন্য ভঙ্গিমায়। এরকম ডানদিকে পাশ-ফিরে কোনাকুনি করে দাঁড়ানো মূর্তি সহসা দেখা যায় না। ডান পায়ে ভাঁজ, বাঁ পায়ের নিচের দিকটা ভাঙা। মাটিতে দাঁড় করিয়ে রাখা ওটাকে গদা না তোমর ঠিক

বলতে পারি না। দুটি হাত যেন গদা বা তোমরের উপর রাখা। অলঙ্কারাদি দেখছি রাবণরাজার থেকেও বেশি সুন্দর। মূর্তির মাথার উপরে শিলালিপিতে বলা হয়েছে বলদেবের পুত্র দুগ্গিলাচার্য এই চমৎকার ভাস্কর্যের স্রষ্টা। এখানে আছে নরসিংহ মূর্তি — হিরণ্যকশিপু সংহারের দৃশ্য।

চিত্র- ১৭। দ্বারপাল, দ(িণ মুখমণ্ডপ।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে আমরা উপরে উঠে পুবদিকের মুখমণ্ডপ তথা প্রবেশদ্বারে পৌঁছলাম। দু'পাশে বসার জন্য ক(াসন রয়েছে। ক(াসনের উপরদিকটা অনাবৃত। চারপাশে চতুষ্কোন স্তম্ভ। সুন্দর সুন্দর মূর্তি উৎকীর্ণ রয়েছে স্তম্ভগাত্রে। মন্দির সংলগ্ন স্তম্ভের দু'পাশে পূর্ণাবয়ব শৈব দ্বারপাল। সামনের স্তম্ভের মূর্তি মুখোমুখি অবস্থানে। দণ্ডায়মান শিব-পার্বতী মূর্তিটি বেশি ভালো লাগল। শিলালিপিতে বলা হয়েছে বিজয়াদিত্য সত্যশ্রায় মন্দিরের গন্ধর্বদের জন্য যে দান করেছিলেন, তারই নবীকরণ করছেন লোকমহাদেবী এবং 'শ্রীগুপ্পা দুগ্গাদিদুগ্গামা' তাতে সম্মতি জানাচ্ছেন। লিখিত হয়েছে ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র বিষয়ের ব্যাখ্যাকার 'অছালন'-এর প্রতি প্রশংসাবাক্য। আরেক স্থানে 'নারেয়মগল্ল' নামের এক গ্রাম দানের কথা উল্লিখিত আছে।

চিত্র- ১৮। দম্পতি, পূর্ব মুখমণ্ডপ।

উত্তরদিকের মুখমণ্ডপের এক কোষ্ঠে আছে অপস্মার তথা মৃত্যুর উপর অষ্টভুজ শিবের নৃত্যরূপ। কাছেই এক স্তম্ভে ৭৮২ সনের উল্লেখ ল(্যনীয়। রাষ্ট্রকূট রাজা কালিবল্লাহ (ধ্রুব) সময়কালের কথা। বলা হয়েছে মন্দিরের সেবায় রতা গোবিন্দপোট্টের কন্যা বাদিপোট্টে গোদান করেছেন। মুখমণ্ডপে চমৎকার দম্পতি মূর্তি আছে। বাইরের স্তম্ভের দিকেপূর্বমুখী অবস্থানে। পুরুষটির ডান হাত কোমরে — নারীর পিছন

চিত্র- ১৯। দম্পতি, উত্তর মুখমণ্ডপ।

থেকে বাঁ হাত বাড়িয়ে গাছ থেকে আম পাড়ছে। নারীর নিচের পরিধান অনেকটা বার্মিজ লুঙ্গির মতো। দ্বারদেশে দুপাশে চতুর্ভুজ দুই শৈব দ্বারপালের মধ্যে একজন প্রায় অ(ত অন্যজনের একটি হাত আর পা নেই। অস্ত্রটিও লুপ্তপ্রায়। আছে স্তম্ভের বাইরের দিকে গজেন্দ্রমো(চিত্র।

মুখ্য মণ্ডপের ভিতরে প্রবেশ করলাম। মুখ্য মণ্ডপে র পরে অন্তরাল ও গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহ ঘিরে প্রদ(িণ পথ আছে। আঠারখানি একশিলা (মনোলিথিক) স্তম্ভের উপর ভর করে দণ্ডায়মান মুখ্যমণ্ডপটি। ভিতরে দু'পাশে আরো দুটি পূজাবেদী রয়েছে — যাকে আমরা পার্শ্বমন্দির বলছি। ডানহাতে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা এবং বাঁহাতে সিদ্ধিদাতা গণেশের আসন।

মণ্ডপের থামের উপর বাস-রিলিফে খোদিত প্রশস্ত পটি। উপরের দিকে অর্ধ-গোলাকার পদক (মেডালিয়ন)। নিচে নেমে গিয়েছে খাড়া আরেকটি পটি। তারপর অর্ধ-গোলাকার পদক। পটির রিলিফে দু'তিন সারিতে মূর্ত হয়েছে রামায়ণ-মহাভারতের কথা। রামায়ণের কাহিনী স্তম্ভের দ(িণ পাশে কারণ রামায়ণের মূল ঘটনা দ(িণ ভারতে। মহাভারতের কথা উত্তর পার্শ্বে কারণ মহাভারতীয় ঘটনাপুঞ্জ ঘটেছিল উত্তর ভারতে।

একটি প্যানেলে দেখলাম রাম-সীতা-ল(ণ বসে আছেন। পাশেই শূর্পনখার নাসিকা-ছেদন চিত্র। খর-দূষণের সঙ্গে যুদ্ধ, রাবনের কাছে শুর্পনখার অভিযোগ নিবেদন, মারীচের স্বর্ণমৃগ রূপধারণ করে রামকে নিয়ে দূরে পলায়ন। খুদে খুদে মূর্তির চিত্রমালা থেকে পরিচিত কাহিনী খানিকটা চিনে নেওয়া যায় বটে তবে সময় লাগে। গাইডের সাহায্য এ(ত্রে সময় বাঁচায়।

একটি প্যানেলে ভীষ্মের শরশয্যা দেখলাম। আছে গঙ্গাবতরণ, সমুদ্রমন্থন ও কিরাতার্জুনের সংবাদ। মহাভারত মানেই তো যুদ্ধ। রথারোহী তীরন্দাজদের মধ্যে অর্জুন বা কর্ণকে চিনে নেওয়ার মতো সময় হল না।

বাডিগের আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল — মণ্ডপের স্তম্ভে এমন সুন্দর কৌতুক চিত্র খোদাই করা আছে যা একদিক থেকে দেখলে মহিষ মনে হবে অন্যদিক থেকে দেখলে হাতির মতো।

দেখলাম — সত্যিই তাই। উ পরের অর্ধগোলাকৃতি পদকের মধ্যে এই রকম কৌতুকচিত্র খেদিত রয়েছে। আরেকটি স্তম্ভের কাছে ডেকে নিয়ে বলল — এই দেখুন, চার পা

চিত্র- ২০। স্তম্ভ-ভাস্কর্য, বিরূপা(মন্দির।

ও তিন মাথায় এক আশ্চর্য নৃত্যভঙ্গীমা। চার পা এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে তিনজনের জোড়া পায়ের ভঙ্গী আলাদা করে বুঝে নেওয়া যায়। দুপাশে দুজন বাদক-বাদিকা। এও আসলে কৌতুক চিত্র। খোদিত হয়েছে এমন নৈপুণ্যের সঙ্গে যাতে, যে কোন দুটি মাথা ও দুটো পা আড়াল করে রাখলেও চিত্রের নৃত্যছন্দ বজায় থাকে।

ভিতরের মন্দিরের স্তম্ভিকায় বেশ কিছু সুন্দর দম্পতির মূর্তি নজর কাঁড়ে। আছে মন্মথ-রতির মূর্তি। গাইড না চেনালে অবশ্য জানতে পারতাম না। একটি চিত্রে কাছেই বানর দেখে ভীত পুরুষটি পত্নীর বাঁহাতখানি শক্ত(করে ধরে আছে।

চিত্র- ২১। উত্তর-পূর্ব দিক থেকে বিরূপা(মন্দির।

মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে এলাম। ভূমি থেকে শীর্ষ পর্যন্ত বর্গাকৃতি মন্দির-বিমান দেখতে সঙ্গমে(েরের মতোই। বিশাল চতুস্তল শিখর। সমচতুষ্কোণ তলে ত্র(মশ ছোট হতে হতে আকাশ-ছোঁয়া হয়েছে। প্রত্যেক তল-প্রস্তর সজ্জিত হয়েছে কর্ণকূট, পঞ্জর ও ভদ্রশালার অলঙ্করণে। দ্বিতলে সামনের দিকে প্রসারিত শুকনাসিকা। দ্বিতলের চারকোণায় চার কর্ণকূট এবং তিনদিকে তিনটি করে ভদ্রশালা। সামনের দিকের ভদ্রশালা ঢেকে গিয়েছে শুকনাসিকায়। তৃতীয় তলের সামনের দিকে শুকনাসিকার খানিকটা অংশ উঠে এসেছে। চতুর্থ তলের সর্বোচ্চ উচ্চতায় কেবল চার কর্ণকূট শোভা পাচ্ছে। নিচে অর্ধগোলাকার সম্মুখচিত্র সহকারে শুকনাসিকা আত্মপ্রকাশ করেছে। সামনের দিক থেকে দেখলে, অনেকটা চৈত্যগবা(র মতো মনে হয়। সেখানে তাণ্ডব-শিব মূর্তি খোদিত কিনা দূর থেকে বোঝা গেল না। আড়ালে শিখরগ্রীবা। উপরে চৌকো আদলের কর্ণকূট-শিখর।

চিত্র- ২২। বিমান, বিরূপা(মন্দির।

নিচের দিকে নজর করা যাক। মন্দিরের বাইরের দেয়াল দেখছি ন'টি ভদ্র বা খণ্ডে বিভক্ত(। পাঁচ খণ্ড সামনে এগিয়ে এসেছে আর এগিয়ে-আসা খণ্ডের মাঝখানে চারটি খণ্ড রয়েছে পিছিয়ে। পাঁচ এগিয়ে-আসা খণ্ডের মধ্যে মাঝেরটি দীর্ঘতম। উপরের প্রস্তর-বরণ্ডিতে ভদ্রশালা শোভা পাচ্ছে। কোনার খণ্ডদুটি মাঝারি দৈর্ঘ্যের(প্রস্তর-বরণ্ডিতে কর্ণকূট রয়েছে। অন্তবর্তী খণ্ডদুটি সবথেকে ছোট। সেখানে চৈত্যের মতো পঞ্জর শোভা পাচ্ছে।

মন্দির ঘিরে সমগ্র জঙঘাদেশে দু'পাশে কূটস্তম্ভ দিয়ে পরপর কুলুঙ্গি সাজানো। সেখানে নানা দেবদেবীর মূর্তি। অথবা গবা(-জালি। মূর্তিগুলো বেশ গভীর করে উৎকীর্ণ। বিষু(ও তাঁর নানা অবতার আছে। শিবমূর্তিই বেশি। পুব দেয়ালে চেনা সহজ ত্রিবিত্র(ম বিষু(কে। বলিরাজার কাছে ভি(াপ্রার্থী বিষ(ুর ত্রিবিত্র(ম মূর্তি। বৃ(তলে দম্পতির মূর্তি আছে দ(ণমুখী অবস্থানে। তারপর পুবমুখী শিবের লিঙ্গোদ্ভব এবং অষ্টভুজ শিবের পদতলে শায়িত দানব।

চিত্র- ২৩। লিঙ্গোদ্ভব মূর্তি।

চিত্র- ২৪। জটায়ু ও রাবণ।

দ(ণ দেয়ালে চিত্রিত হয়েছে নন্দীধ্বজ ও ডমরু হস্তে নাট্য শিবমূর্তি যার দুপাশে ঘট-বাদক এবং বংশীবাদক আছে আর বাম পদতলে দানব পিষ্ট। আছে আকাশ পথে সীতাহরণ ও রাবণ-জটায়ুর যুদ্ধ। চতুর্ভজ শিবের এমন পাট পাট করে ছড়ানো জটার সাজ বিশেষ নজরে পড়ে নি কখনো — বাম পদতলে পিষ্ট দানবই হবে। নিচে শিলালিপিতে খোদিত ভাস্কর চেঙ্গাম্মার নাম। আরেক চিত্রে একজন বর্শায় বিদ্ধ করছে আকাশচারী কাউকে। কাকে জানি না। কে করছে তাও জানি না। পাশে ত্রিভঙ্গে দণ্ডায়মান মূর্তি কার তাও বোঝা গেল না।

চিত্র- ২৫। জটাধারী শিব।

পশ্চিমের দেয়ালে লাকুলিশ আছেন। এখানে বেশ কিছু মূর্তি (য়প্রাপ্ত। তবে সমভঙ্গে দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ বিষ(ু এখনো সুন্দর এবং অ(ত। উত্তর দেয়ালে আছে পুল্লাপ্পন নামক ভাস্কর দ্বারা নির্মিত শিব। আছে অষ্টভুজ বিষ(ুমূর্তি। তারপর ভূ-বরাহ-জটাধারী শিব। বরাহমুখী বিষু(কে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। আছেন অর্ধনারী(ের।

চিত্র- ২৬। পশ্চিম দেয়াল, বিরূপা(মন্দির।

— শিলালিপি দেখেছেন?

— কোথায়?

— কেন এই তো পূর্ব মুখমন্দিরের সামনে।

দেখলাম। লম্বাটে প্রস্তরখণ্ডে খোদিত রয়েছে অতি (ুদ্র হরফে এক দীর্ঘ শিলালিপি। গাইড বলল — প্রাচীন কন্নড় ভাষায় লেখা। এখানে দুজন শিল্পীর নাম আছে, স্বস্তিশ্রী গুণ্ডা অনিবারিতা আচার্য বা ত্রিভুবনাটার্য এবং তেঙ্কন দিশিয় সূত্রধারী সর্বসিদ্ধি আচার্য।

চিত্র- ২৭। উত্তরাংশে, বিরূপা(মন্দির।

প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল গাইড বানিয়ে বলছে নাতো! পরে জেনেছি সত্যি ঐ নামের দুই শিল্পী ছিলেন পাট্টাডাকালের মন্দির নির্মাণে। আরেকজনের শিল্পীর নামও জানা গেল — রেবথি আচার্য। ইনি সর্বসিদ্ধি আচার্যর শিষ্য। অন্য কয়েকজন শিল্পী হলেন বলদেব, চেঙ্গাম্মা ও দেবাচার্য।

সমগ্র মন্দির-চত্বর প্রাচীর-বেষ্টিত চতুর্ভুজ এলাকার মধ্যে রয়েছে। পূর্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্য ২৫০ ফুট। মন্দির অবশ্য ১২০ ফুটের মধ্যে সীমাবদ্ধ। চত্বরের পূর্ব-পশ্চিমে দুটি বিশাল তোরণ আছে — দ(িণ ভারতীয় গোপুরম ধাঁচের। পূর্বমুখী মন্দিরের সামনে-পিছনে। তোরণে অনেক খোদাই আছে। চারদিকের প্রাচীরের কিছু অবশেষ আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ছোট ছোট মন্দির-কুঠুরী ছিল প্রাচীর ঘেঁষে। দেবতা-পরিবারের অন্যান্য দেবদেবীর জন্য নির্মিত হয়েছিল এই পরিবারালয়। সম্ভবত বত্রিশটি কুঠুরী ছিল। দ্বিতল মন্দির-কুঠুরী। কূট বা শালা ধরণের অলঙ্করণের অবশেষ দেখা যাচ্ছে।

মূলমন্দিরের সামনে পৃথক অধিষ্ঠানে নন্দীমণ্ডপ। সাড়ে আট ফুট উঁচু নন্দী অধিষ্ঠিত। মন্দিরের পাথর পিঙ্ক রঙের বেলেপাথর, নন্দীর মূর্তি গাঢ় সবুজ পাথরের। মুক্ত(মণ্ডপের চার কোনায় চারটি স্তম্ভ। কয়েকটি সুন্দর ভাস্কর্য আছে পশ্চিম ও দ(িণ স্তম্ভ-দেয়ালে। অপরূপ লীলায়িত ভঙ্গীমায় নারীমূর্তি। এক জায়গায় সর্বসিদ্ধি আচার্যের নাম আছে মন্দিরের ভাস্কর হিসেবে। ইন্দ্রানীর মূর্তি আছে হাতে গজধবজ নিয়ে। আরেক জায়গায় নারীর ডানহাতের উপর বসে শুকপাখি।

চিত্র- ২৭। দ(িণ দিক থেকে নন্দী মন্দির।

চিত্র- ২৮। পূর্ব দিক থেকে নন্দী মন্দির।

স্থানীয় এক পরিবার নন্দীকে ঘিরে বসে আছে। পূজাপাঠ চলছে। মূলমন্দিরেও সম্প্রতি পূজার্চনা চালু হয়েছে।

গাইড বলেছিল — আপনারা ইচ্ছে করলে পূজো দিতে পারেন।

আমরা ঐতিহাসিক স্থাপত্য-ভাস্কর্য দেখতে এসেছি। ভোলানাথের চরণে নিখাদ প্রণামই নিবেদন করলাম। গাইড বাডিগের বোধহয় তেমন খুশি হল না।

বিরূপা(মন্দিরের পাশে একটু পিছনের দিকে মল্লিকার্জুন মন্দির। ৭৪৫ খৃষ্টাব্দে নির্মিত। তৈরী করেন বিত্র(মাদিত্যের আরেক রানি ত্রৈলোক্য মহাদেবী। আকার-আয়তনে বিরূপা(মন্দিরের তুলনায় ছোট, তবে ভাস্কর্যে তুলনীয়। মন্দিরের গঠনরীতি বিরূপা(র মতোই। গর্ভগৃহ-অন্তরাল ও সভামণ্ডপ আছে। তিনদিকে তিনটি মুখমণ্ডপ। এটিরও চতুস্তল শিখর-বিমান। কেবল শীর্ষস্থিত গ্রীবা গোলাকার এবং সর্বোচ্চ তলে কূট বা ভদ্রশালা নেই। বলা হয়, এখানে বেসর নির্মাণ রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। শুকনাসার মুখপট্টিতে নাট্যশিবের মূর্তি।

পুবদিকের মুখমণ্ডপে উগ্র নরসিংহ মূর্তি খোদিত। সেখানে 'শ্রীপেরগাদে' (রাজা) এই কথাটি লিখিত আছে। খুব সুন্দর বিপরীতে দুই নারীর একখানি চিত্র - ত্রিভঙ্গ এক রমণীর হাতে ধরা সানাই-র মতো যন্ত্র যার নিচের দিকটা বামন সহচরী ধরে আছে আর অন্য রমণী নৃত্যরতা যার উপরে-তোলা ডানহাতে ধরা চামর। দুজনের দুরকম কবরী।

পরিধেয় বসন আটোসাটো লুঙ্গির মতো যেমনটা বিরূপা(মন্দিরেও দেখেছি।

সভামণ্ডপে চার সারিতে ষোলোটি স্তম্ভ। তারপর অন্তরালে দুটি স্তম্ভ। দুপাশে দুটি পা(র্শমন্দির। একটিতে মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি।

মণ্ডপের প্রস্তর স্তম্ভে শ্রীকৃষে(র জন্মকথা ও জীবনকাহিনী খোদিত রয়েছে।

চিত্র- ৩০। ভাস্কর্য, মল্লিকার্জুন মন্দির।

চিত্র- ২৯। মল্লিকার্জুন মন্দির।

খোদিত রয়েছে সমুদ্র-মন্থন ও শিব-পার্বতীর বিবাহ, রামায়ণের কথা, মহাভারতের কথা, টিট্টিভ গরুড় কাহিনী, পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী।

অশোক বলল — মণ্ডপের উত্তর দিকের স্তম্ভে রাজারানির যে মূর্তি রয়েছে তা রাজা বিত্র(মাদিত্য ও ত্রৈলোক্য মহাদেবীর। রাজার বাঁদিকে রানির মূর্তি। বামহস্তে জড়িয়ে। রানির ডানহাত রাজার কাঁধের উপর। রাজার মাথায় জড়ানো-পেঁচানো-কার্ল করা চুলের শোভা। মুকুটের মতো লাগছে। কবজি-বাহুতে কুণ্ডলিত অঙ্গদ ও কঙ্কণ। কোমরের নিম্নভাগ ভাঙা। রানির অলঙ্করণে রত্নখচিত কণ্ঠহার, ব্রেসলেট ও কটিভূষণ।

উপরের সিলিংয়ে রয়েছে গজলক্ষ্মী, শিব-পার্বতী ও মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি।

গাইড ভারতীকে দেখাল — কত বিচিত্র রকমের কবরীবন্ধন তখন ছিল দেখুন দিদিভাই।

মন্দিরের বাইরে উত্তর-দেয়ালের কুলুঙ্গিতে বিষু(ও শিবের মূর্তি, পশ্চিমে তাণ্ডব ও অর্ধনারী(শ্বরের মূর্তি আর দ(িণে ভৈরব, শিব-

চিত্র- ৩১। অসম্পূর্ণ ভাস্কর্য।

পার্বতী, লাকুলিশ মূর্তি রয়েছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, মন্দির-নির্মাণ শু(হয়েছিল বটে কিন্তু সময়ে শেষ করা সম্ভব হয়নি। যেন তাড়া ছিল কাজ শেষ করার। স্তম্ভ ও কড়ির উপরকার খোদাই পুরো না করেই পাথুরে কড়ি তুলে বসানো হয়েছে। বাডিগের দেখাল অনেক অসম্পূর্ণ শিল্প উৎকীর্ণ রয়েছে স্তম্ভে এবং স্তম্ভের উপরকার পাথুরে কড়িতে। শুধু বাইরের আউট লাইন টানা হয়েছে, খোদাই শু(হয়নি।

বাইরের দিকে অবস্থিত নন্দীমন্দির ভেঙে গিয়েছে। নন্দীর অবস্থাও তদনুরূপ। মণ্ডপের অধিষ্ঠানে নানা ভঙ্গীমায় হাতির সারি বেশ আকর্ষনীয়।

উপাস্য দেবতা বিরূপা(মন্দিরের মতো কালো পাথরের লিঙ্গমূর্তি। এখানে পূজা হয় না। কেননা মন্দিরের ভগ্নবিগ্রহ মর্যাদাহীন।

মল্লিকার্জুন মন্দির এবং কাশী বিশ্বে(শ্বর মন্দিরের সামনে অষ্টভুজ ত্রিশূল স্তম্ভ আছে যার গায়ে কন্নড় ভাষায় শিলালিপি খোদিত। কথিত হয়েছে — স্তম্ভটি বিত্র(মাদিত্যর রানি লোকমাতা (লোকমহাদেবী) এবং রাজা কীর্তিবর্মন-২ মাতা ত্রৈলোক্যমহাদেবী দ্বারা নির্মিত। মৃগথানিকহার বিষয়ের জ্ঞানশিবাচার্য স্তম্ভের নির্মাণের সঙ্গে জড়িত। ইনি বিজয়ে(শ্বর মন্দিরে বসবাস করেন এবং মন্দিরের পূজাদির জন্য ত্রিশটি স্বর্ণমুদ্রা দান করেছিলেন। রাজা কীর্তিবর্মনের নাম থেকে স্তম্ভের নির্মাণকাল অষ্টম শতকের শেষভাগে অনুমান করা হয়েছে।

চিত্র- ৩২। ত্রিশূল স্তম্ভ।

সংর(িত এলাকার বাইরে দ(িণ দিকে গ্রামের মধ্যে অবস্থিত পাপানাথ মন্দির। ৬৮০ খৃষ্টাব্দে নির্মাণ করা হয়। নির্মাণকাল নিয়ে খটকা থেকে গেল মনে। মন্দিরটি নাকি ইলোরার কৈলাস মন্দিরের আদলে তৈরী। যদি তাই হয় তবে তো একেই প্রাচীনতম মন্দির বলা উচিত ছিল। গর্ভগৃহ, অন্তরাল, মণ্ডপ ও অলিন্দ আছে। উত্তর ভারতীয় নাগর রীতির শিখর। মন্দিরের ভিতরে প্রহরায় রয়েছে শিবানুচর নন্দী ও বীরভদ্র। তবে তা কেউ কেউ বলছেন পরবর্তীকালের সংযোজন। দারুণ সুন্দর কাজকরা ষোলোটি স্তম্ভ আছে। রামায়ণ-মহাভারতের আখ্যান চিত্রিত সেখানে। সিলিংয়ে অষ্টদিকপালের মূর্তি আছে। বিষু(শেষনাগের শয্যায় শায়িত। গ(ড় আছে, গজলক্ষ্মী আছে। প্রদ(িণপথের উপর তিন কুলুঙ্গিতে আছেন শিব, বিষু(ও সূর্য। অনেকে বলেন আগে এটি আদিতে বিষু(মন্দির বা সূর্যমন্দির ছিল। পরে শৈবমন্দির হয়।

পশ্চিমে আধ কিলোমিটার দূরে রয়েছে রাষ্ট্রকূটদের জৈন মন্দির। নবম শতকে দ্রাবিড় রীতিতে গড়া। বাহক-সহ দুটি অভিনব হাতি আছে সেখানে। দুটি উপবিষ্ট জৈনমূর্তি আছে। অসম্পূর্ণ মন্দির। আমাদের পাপানাথ ও জৈন মন্দির দেখে আসার মতো সময় ছিল না।

খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ ও ৩য় শতকের মেগালিথ কালপর্বের কিছু নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে পাট্টাডাকালে। এতদ্বারা বোঝা যায় যে অঞ্চলটি অতি প্রাচীনকাল থেকে মনুষ্যবসতিপূর্ণ ছিল।

চিত্র - ৩৩। পাট্টাডাকালে বাঁদিকে অশোক বাডিগের।

অশোক বাডিগেরকে পরিসেবার জন্য দিয়েছি চল্লিশ টাকা। বড়ো দল হলে আরেকটু বেশি দেওয়া যেত। ছেলেটিকে আমাদের ভালোই লেগেছিল। মন্দির-স্থাপত্য সম্পর্কে ওর ব্যাখ্যা আমাদের অনেক কিছু শিখতে সাহায্য করেছে। ওকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বিদায় নিলাম আইহোলি যাওয়ার জন্য।

বলতে না বলতেই কোত্থেকে একগোছা মানুষ নিয়ে অটো চলে গেল হুস করে আইহোল। ভিতরে যাত্রীর ভিড়। পিছনেও পা-ঝুলিয়ে বসেছে নরনারী। অশোক 'রোককে রোককে' বলে ছুটে গিয়েও অটো থামাতে পারল না। না পা(ক। আমরা ওভাবে পা ঝুলিয়ে বসে যেতে পারতুম কিনা সন্দেহ। খবর নিয়ে জানাল — আইহোল যাওয়ার অটো পাওয়া যাবে না। বিকেল চারটের বাসে যেতে হবে। নয়তো গ(ড় বা আমিনগড় হয়ে যেতে হবে।

হাতে সময় আছে কিন্তু গাড়ির অভাব। আইহোল যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই দেখছি না। অচেনা জায়গায় গ(ড় বা আমিনগড় হয়ে ঘুরপথে পা বাড়ানো যেত। তবে সাহস হচ্ছে না। বিকেল চারটের বাসে আইহোল থেকে বাদামীর বাস ধরতে পারব কিনা সন্দেহ আছে। এদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের উপর পুরোপুরি নির্ভর করা যাচ্ছে না।

ভাষা একটা বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে যদিও কাজ চালানো যাচ্ছে। ভারতীকে বললাম — তার থেকে চলো আজ ফিরে যাই। বাদামীর গুহামন্দির দেখে রাখা যাক। সম্ভব হলে আগামীকাল সকালে একবার আইহোলের চেষ্টা করা যাবে।

ও বলল — হ্যাঁ তাই চলো।

বাডিগের স্থানীয় ডাকঘর থেকে পাট্টাডাকাল মন্দিরের স্ট্যাম্প-ছাপ নিতে বলেছিল। বাসস্ট্যাণ্ডের পথেই ডাকঘর। পোস্টকার্ডের উপর সেই ছাপ নেওয়া হল স্মারক হিসেবে। গলগনাথ মন্দিরের ছাপ।

আমরা সরকারী বাসের অপে(ায় বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছি। মিনিবাস ফেরার জন্য ডাকাডাকি করছে। ভু(েপ করছি না। বারবার চোখ চলে যাচ্ছে পাট্টাডাকালের ধ্বংসস্তূপের দিকে। নীলাকাশে দুচার টুকরো সাদা মেঘের পানসী ভেসে বেরাচ্ছে। লালমাটি আর সবুজ গাছপালা উজ্জ্বল রোদে ঝলমল করছে। শান্ত জনপদ। কোলাহল নেই কোথাও।

ঐ তো ইতিহাস-স্নাত প্রস্তর-স্তূপ পড়ে আছে। একদা মানুষেরা এখানে দেববন্দনা করত। রাজরাজাদের সমাগমে মুখর থাকত সুসজ্জিত দেবালয়। প্রায় তেরোশ' বছর আগে। আজ কিছু নেই। মন্দিরের ভগ্নদেহে ঘোর শূন্যতা বিরাজ করছে। নিস্পৃহ উদাসীনতায় (য়প্রাপ্ত প্রস্তরমূর্তি চুপ করে আছে। শিল্পীর কল্পমানসে এই সকল দেবদেবী-গন্ধর্ব-কিন্নরীর স্বরূপ ভেসে উঠেছিল একদিন। তারই রূপায়ণ হয়েছিল ধূসর পাথরের বাস্তবতায়। আজ তাতে (য় ধরেছে। বিবর্ণতা ছড়াচ্ছে দ্রুত। কেমন মায়া জন্মে যাচ্ছে।

পাট্টাডাকাল এখুনি ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে করছে না। আরেকটু সময় যদি থাকা যেত!

৬। বাদামী গুহামন্দির

পাট্টাডাকাল থেকে বাদামী ফিরে এসেছি। দিনের আলো ফুরোতে এখনও অনেক দেরি। ভাবলাম সময় নষ্ট না করে বাদামীর বিখ্যাত গুহামন্দির দেখে নেওয়া যাক।

পায়ে হেঁটে পৌঁছতে সময় লাগবে। বাসস্ট্যাণ্ড থেকে অটো করলাম। সময় বাঁচাতে হবে। পনেরো টাকা ভাড়া নেবে বলল। তা নিকগে। তাছাড়া অর্ধাহারে ক্লান্তও লাগছে একটু।

বাদামী রেলস্টেশন থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে গুহামন্দির। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের নির্মাণ। বাস-আড্ডা থেকে আমাদের যেতে হল দ(িণ দিকে। প্রায় এক কিলোমিটার পথ। রাস্তা থেকে সামান্য উঁচুতে দ(িণদিকের পাহাড়ের কোলে গুহামন্দির চত্বর। প্রবেশমূল্য পাঁচ টাকা।

গেটে টিকিট চেক করতে করতে পাহারাদার বলল — উপরে হনুমানের উৎপাত খুব। লাগেজ (মে ব্যাগ জমা রেখে উপরের দিকে যেতে পারেন।

আমরা ব্যাগ জমা রেখে যেতে রাজি নই। এমন কিছু ওজন নয় ব্যাগের। সঙ্গে নিয়ে ঘুরব বলে সেরকমভাবে জিনিসপত্র এনেছি। আমাদের কথা শুনে প্রহরী খুশি হল না। বলল — যেমন আপনাদের ইচ্ছা।

গেট পেরিয়ে উপরের দিকে পা বাড়ালাম। ডানহাতে পাহাড় এবং পাহাড় কেটে নির্মিত সুপ্রাচীন গুহামন্দির।

মন্দির নির্মাণের আদি যুগে আমরা বেশ কিছু পাহাড় কেটে তৈরী মন্দির-গুহা দেখতে পাই। যতদূর জানি, গুহামন্দির নির্মাণ শু(করেছিলেন মৌর্যসম্রাট অশোক। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে গয়ার কাছে। পরে পশ্চিম ভারতের নরম পাথর খোদাই করে অনেক গুহা নির্মাণ করা হয় পুনা, নাসিক ও অজন্তা-ইলোরায়। কিছু উড়িষ্যার উদয়গিরি-খণ্ডগিরিতে আর কিছু অন্ধ্রপ্রদেশে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে বাদামীর চালুক্যরা যে গুহামন্দির নির্মাণ শু(করে, পরে তা অনুসরণ করেছে মান্য(তের রাষ্ট্রকূট, কাঞ্চির পল্লব এবং মাদুরাইর পাণ্ড্যরা। বাদামীতে আনুভূমিক তলে স্তরীভূত লালচে বেলেপাথরের উপর খোদাই কাজ করা চালুক্যদের কাছে তুলনায় সহজ ছিল। এখানে তারা চারটি গুহামন্দির নির্মাণ করে গিয়েছে — দুটি বিষু(র, একটি শিব এবং একটি জৈন মন্দির।

সাধারণভাবে প্রত্যেক গুহামন্দিরের সামনে রয়েছে খানিকটা উন্মুক্ত(চত্বর। গুহার

সামনের অংশে আয়তাকার বারান্দা যাকে আমরা মুখমণ্ডপ বলতে পারি। ভিতরের দিকে আয়তাকার সভাক(রচিত মহামণ্ডপ। একেবারে পিছনের দিকে অপে(াকৃত ছোট আকারের বর্গাকৃতি গর্ভগৃহ। এই তিন মণ্ডপ নিয়ে এক একটি গুহামন্দির নির্মিত হয়েছে। সবই পাহাড়ের পাথর কুঁদে বানানো। গুহামন্দিরের প্রবেশমুখ (ফ্যাসাড) তুলনায় সুপ্রশস্ত।

এক ব্যক্তি(গাইড পরিচয় দিয়ে এগিয়ে এল। পারিশ্রমিক বাবদ দাবী করল ষাট টাকা। আমাদের প্রস্তাব — চল্লিশ টাকা। গাইড রাজী হল না। আমরাও মাথাপিছু গাইড-খরচা কুড়ি টাকার থিয়োরিতে অটল রইলাম।

চিত্র- ৩৪। বাদামীর ১ম গুহামন্দির।

প্রথম গুহামন্দির চত্বরে পৌঁছতে বেশ কিছু সিঁড়ি ভাঙতে হল। এটি শৈবমন্দির। গুহামুখটি যথারীতি বেশ প্রশস্ত। উঁচু অধিষ্ঠান 'গণ'-ফ্রিজে সজ্জিত। মুখমণ্ডপের সামনের সারিতে দণ্ডায়মান চারকোনা স্তম্ভ। বলিষ্ঠ ও দীঘল। স্তম্ভ ঘিরে লম্বাটে পটি এবং গোলাকৃতি পদক-অলঙ্কার রয়েছে। পদকের ভিতরে দেবদেবীর মূর্তি আছে। পটিতে কীর্তিমুখ বা সিংহমুখ খোদিত। মুখ থেকে মুক্ত(ার দানা ঝরছে। স্তম্ভের উপর প্রস্তর-কড়ি (বিম) এবং তার নিচে রয়েছে ব্রাকেট বা পোটিকা। একেবারে সামনে উপরদিকে কপোটা বা কার্নিস। গুহার উপরের দিকে পাহাড়ে বাদামী দুর্গের বু(জ দেখা যাচ্ছে।

আয়তাকার মুখমণ্ডপ। সামনের সারিতে চারটি স্তম্ভ। পিছনের দিকে দুটি। ভিতরের দিকে মহামণ্ডপ ও গর্ভগৃহ রয়েছে। চতুষ্কোণ লিঙ্গপীঠের উপর শিবলিঙ্গের অবস্থান।

সবার আগে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ডানহাতে পশ্চিমদিকের লালচে দেয়ালে

চিত্র-৩৫। নৃত্যরত শিব, ১ম গুহা।

খোদিত নটরাজ শিবের এক আশ্চর্য মূর্তি। অর্ধোৎকীর্ণ রিলিফে অষ্টাদশভুজ নৃত্যরত শিব। উচ্চতা দেড় মিটারের মতো হবে হয়তো। অপরূপ এই ভাস্কর্যটি যে কত সুন্দর তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। আমরা নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলাম অনেক(ণ। এক বিদেশী পর্যটকও ক্যামেরা হাতে চুপচাপ বসে আছেন সামান্য দূরে উঁচু পাথরের উপরে। তাঁর তন্ময়ভাবটি দৃশ্যত পরিস্ফুট। মনে হল উনিও বসে বসে ভাবছেন কিভাবে এই চমৎকার শিল্পকর্মটির ছবি তোলা যায়। আমরাও ভাবছি কিভাবে ছবি তুলি যাতে অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তির স্বরূপ কিছুটা হলেও ফুটে ওঠে।

এমনিতে আঠারো হাতের শিবমূর্তি সচরাচর দেখা যায় না। সে নাহয় হল। ভাস্কর্যটির বিশেষত্ব অন্যত্র। আঠারো হাতের যে কোন একটি ডানহাতের সঙ্গে নয় বাঁ হাতের যে কোন বাঁ হাত মিলিয়ে দেখলে ধরা পড়বে একটি করে মুদ্রা – মোট ন'টি নাচের মুদ্রা। এভাবে প্রত্যেক ডান হাতের সঙ্গে প্রত্যেক বাঁ হাতের কম্বিনেশনে নটরাজের একাশি নৃত্যমুদ্রা রচিত হয়েছে। নটরাজ শিবের ডানপা ভুমিতে। বামপা ভাঁজ করা – পায়ের আঙুল ভূমি স্পর্শ করেছে মাত্র। পরে জেনেছি একে শিবের 'চতুরম মূর্তি' বলে। তাঁর কোন এক বাঁহাতে গজহস্ত মূদ্রা আছে এবং দুটি ডান হাতে চতুরা ও অঞ্চিতা মুদ্রা। দেবতার হাতে কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে – ত্রিশূল, পরশু (কুঠার), ড্ম(, নাগ এসব তো সহজেই বোঝা যাচ্ছে। আরো কিছু অস্ত্র আছে – ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

দেবতা বেদীর উপরে অধিষ্ঠিত এবং নানা অলঙ্কারে শোভিত। মস্তকে অলঙ্কৃত জটামুকুট, কানে কুণ্ডল, গলায় কণ্ঠহার, বুকে উদরবন্ধ, কটিতে কটিসূত্র, বাহুতে অঙ্গদ-কঙ্কণ ইত্যাদি। মাথার পিছনে উপবৃত্তাকার প্রভামণ্ডল। বামপার্শ্বে নৃত্যরত গণেশ দাঁড়িয়ে। দ(ণে বাহন ষণ্ডের সম্মুখ ভাগ। গণেশের পাশে দুটি ঢাক-জাতীয় বাদ্যযন্ত্র।

চিত্র-৩৬। ১ম গুহার স্তম্ভসারি।

চিত্র-৩৭। মহিষাসুরমর্দিনী।

আরেকটি মূর্তি আছে উপবিষ্ট অবস্থায়। ওটা কার মূর্তি ঠিক বোঝা গেল না। হতে পারে নন্দী(র। মনে হচ্ছে যেন বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছেন।

খানকয়েক ধাপ পেরিয়ে মুত্ত(অলিন্দে উঠে দাঁড়ালাম। মণ্ডপের ভিতরের দিকের স্তম্ভসারি একটু অন্যরকম। নিচের দিকটা বর্গাকার কিন্তু উপরের দিকটা বৃত্তাকার – উপরে কুম্ভ বা কলস দ্বারা শোভিত। গুহামন্দিরের সিলিং কা(কার্যখচিত। অলিন্দে দ্বারপাল ও নন্দী আছে। পশ্চিমে প্রসারিত অংশে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা ও কার্তিক-গণেশ মূর্তি রয়েছে।

মুখমণ্ডপের এক প্রান্তে খোদিত হয়েছে শিব-বিষু(র সমন্বয়ে গঠিত চতুর্ভুজ হরিহর মূর্তি। সমভঙ্গে দণ্ডামান। দ(িণে হর, বামে হরি। মস্তকের একাংশে জটামুকুট তো অন্য অংশে কিরীটমুকুট। ডানহাতে পরশু-নাগাস্ত্র ও অভয়মুদ্রা। বাঁহাতে শঙ্খ ও তোমর। তারপর একপাশে (দ্রাকার ষণ্ডমুখী নন্দী দণ্ড হাতে দাঁড়িয়ে। অন্যপাশে বামনরূপী গ(ড়। তার দু'পাশে পূর্ণাবয়ব পার্বতী-লক্ষ্মী। উপরদিকে কিন্নর-কিন্নরীরা পুষ্পমালা হাতে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। নিচের বেদীতে গণ-মূর্তির সারি। তাঁরা কেউ গীতবাদ্য রত কেউ নৃত্য মুদ্রায়।

চিত্র-৩৮। হরিহর।

চিত্র-৩৯। অর্ধনারী(র।

অন্য প্রান্তের প্যানেলে দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ অর্ধনারী(র। বাহনসহ। ডানদিকটায় শিব-রূপ এবং বাঁদিকটায় উমার প্রতীতি। দেবতার দু'হাতে বীণা। অন্য দুহাতে নাগজড়িত পরশু ও নীলোৎপল। মাথায় একপাশে আধখানা জটামুকুট, অন্যপাশে আধখানা করণ্ডমুকুট। দেবীর কাঁধের উপর নেমে এসেছে কবরীবন্ধন। শিবের কর্ণে নাগ-কুণ্ডল, বাহুতে সর্পভূষণ। উমার বাহুতে অবশ্য কেয়ুর-কঙ্কণ, কটিতে মেখলা এবং পায়ে অলঙ্কার। পাশে যেন বাঁহাতের থালায় পূজার্ঘ্য নিয়ে সালঙ্করা এক নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে। তাঁর চুল উঁচু করে বাঁধা। শুনেছি একে ধাম্মিল্ল স্টাইল বলে। ডাইনে বৃষ এবং করজোড়ে দণ্ডায়মান কৃশকায় ভৈরব। আকাশচারী অন্য দেবদেবীরা আছেন। নিচে গণ-জাতীয়

দেবানুরাগীদের নৃত্যসঙ্গীত চলছে। মূর্তিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে বেশ লাগছিল। আসলে মূর্তির এতটা কাছে দাঁড়িয়ে এবং নির্ঝঞ্ঝাটে হাতে সময় নিয়ে দেখার সুযোগ পাওয়া যায় খুব কমই।

চিত্র-৪০। ত্রিবিত্র(ম বিষ(, ২য় গুহা।

একটু এগিয়ে পেলাম দ্বিতীয় গুহা। এটি বিষু(মন্দির। চার গুহার মধ্যে (দ্রতম। অঙ্গনে দ্বারপাল দণ্ডায়মান। এখানেও অলিন্দের দুদিকের প্যানেলে মূর্তি রয়েছে। বাঁদিকের প্যানেলে বরাহ অবতার আর ডানদিকে ত্রিবিত্র(ম বিষু(মূর্তি।

আমাদের ত্রিবিত্র(ম বিষু(মূর্তি অধিক আকর্ষণ করল। এই প্যানেলে দেখছি একাধিক মূর্তিসহ একাধিক দৃশ্যপট। অষ্টভুজ বিষু(র বাঁ পা আকাশমার্গে উত্থিত। সেখানে নি(প্ত নমুচির ওল্টানো দেহ। ভূমিনিবদ্ধ বিষু(র ডান পা দুহাতে জড়িয়ে ধরে বসে আছে মুকুটধারী রাজপুত্র নমুচি। বলিরাজার পুত্র। তাঁর পাশে আরেকটি মূর্তি আছে। বিষু(র হাতে নানা অস্ত্র – চত্র(, অসি, তীর, ধনুক, শঙ্খ, খেটকইত্যাদি। তাঁর এক হাতও আকাশচুম্বী। মাথায় করণ্ডমুকুট, কানে কর্ণভূষণ, কণ্ঠে রত্নহার, কটিবন্ধে মেখলা। বুকে যজ্ঞোপবীত এবং বৈজয়ন্তীমালাও আছে। প্যানেলের নিচের দিকে বাঁহাতে ছত্রধারী বামনাবতার দান প্রার্থনা করছেন বলিরাজার কাছে এসে। রাজার হাতে দানসামগ্রী। প্রার্থী বামন তা প্রত্যাখ্যান করে রাজার কাছে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেছেন। রাজার পাশে রানি ও পিছনে অনুচরবৃন্দ

চিত্র-৪১। ২য় গুহা।

দেখা যাচ্ছে। দানবগুরু শুত্র(াচার্য আছেন নাকি সেই দলে। বলিরাজাকে অঙ্গীকার মতো দানে নিরস্ত করার চেষ্টা করছেন। বেদীতলে নৃত্যগীতরত ছয়জন গণ। মন্দিরের সিলিংয়ে খোদিত অনন্তশয়নে ভগবান বিষু(। সঙ্গে শিব-ব্রহ্মা ও অষ্ট দিকপাল।

আরো কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে আরেকটু উপরে উঠে তৃতীয় গুহা –

বাদামীর প্রধান আকর্ষণ। খোদিত শিলালিপি অনুসারে ৫৭৮ খৃষ্টাব্দে পরাত্র(ান্ত চালুক্য নৃপতি মঙ্গলেশা এই মন্দির নির্মাণ করেছেন। হিসেব কষে দেখলাম – আজ থেকে ১৪২৫ বছর আগে। ভারতীকে সেকথা জানাতেই ও বলে উঠল – তার মানে আমরা প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরোনো কিছু দেখছি। ওরে বাবা, দেড় হাজার বছর পুরোনো ঐতিহাসিক নিদর্শন। ভাবা যায় না।

এই মন্দিরটি আয়তনে বৃহত্তম। শুধু তাই নয়, সবথেকে বেশি কা(কার্যময় ও অলঙ্কৃতও বটে। একদা গর্ভগৃহের শিলাপীঠের উপর বিষু(মূর্তি ছিল। আজ আর নেই। একমাত্র এই মন্দিরের সামনের সারিতে ছ'টি স্তম্ভ। পিছনের সারিতে চারটি।

চিত্র-৪২। ৩য় গুহার একাংশ।

প্রাচীর ভাস্কর্যে শিব ও বিষু(দুজনেই স্বমহিমায় উৎকীর্ণ হয়ে আছেন। ত্রিবিত্র(ম বিষু(আছেন। আছেন চতুর্ভুজ নৃসিংহ, হরিহর ও বরাহ অবতার। আমরা বিশেষ করে খুঁটিয়ে দেখছিলাম বৈকুণ্ঠনাথ বিষু(র মূর্তি যিনি এখানে উপবিষ্ট রয়েছেন আদিশেষের তিন

চিত্র-৪৩। বৈকুণ্ঠনাথ, ৩য় গুহা।

কুণ্ডলীর উপর। তাঁর বসার ভঙ্গী অনন্য। দুপা ভাঁজ করে খানিকটা উবু হয়ে বসেছেন। এক হাঁটু উঁচু-করা, অন্য হাঁটু কাত-করা। মাথার উপরে শোভা পাচ্ছে আদিশেষের ফণা। চতুর্ভুজ দেবতার দুহাতে শঙ্খ ও চত্র(রয়েছে। অন্যদুটি হাতে তিনি কি ধারণ করে রয়েছেন তা ঠিক বোঝা গেল না। তাঁর মস্তকে দীর্ঘ কিরীট, পশ্চাতে প্রভামণ্ডল। বাহুতে কেয়ুর, বাহুমূলে একাধিক কঙ্কণ। কর্ণভূষণ আছে। কণ্ঠে রত্নহার। উদরবন্ধ ও কটিবন্ধও রয়েছে। রত্নখচিত পরিধানখানি বসার জন্য কেমন ভাঁজ খেয়েছে। দীর্ঘ বৈজয়ন্তীহার সামনে লুটোচ্ছে। দুপাশে নিচে আরো অনেক মূর্তি রয়েছে। সকলেই বিরাজ করছেন দৃপ্ত ভঙ্গীতে। বেদীমূলে অনেক গণ-মূর্তির সমাবেশ হয়েছে।

চিত্র-৪৪। ৩য় গুহার ব্রাকেটে।

স্তম্ভের উপরভাগে সুন্দর ব্রাকেট ফিগারও দেখা গেল। ভয়াল মূর্তি ছাড়া শিব-পার্বতী, রতি-মন্মথ, অর্ধনারীশ্বর মূর্তি আছে। বারান্দার মাঝের সিলিং জুড়ে রয়েছেন বিষ্ণু ও দিকপালগণ। চিত্রকলায় ইন্দ্রের প্রাসাদপুরী অঙ্কিত আছে নাকি! আমরা তা বুঝে উঠতে পারিনি। ফলে দেখা হয়নি। পরে শুনেছিলাম বেশ কিছু মূর্তি পরবর্তীকালের সংযোজন। বৈকুণ্ঠনাথ ও বরাহ মূর্তি অবশ্য আদিকালের।

তৃতীয় গুহা দেখে নিচে নেমে বাধানো পথ ধরে চতুর্থ গুহার দিকে এগোচ্ছি। দর্শক সংখ্যা বেশি নয় বলে মানুষের ভিড় নেই। না, প্রহরীর আশঙ্কামতো হনুমান তেমন জ্বালাতন করেনি।

চিত্র-৪৫। ৪র্থ গুহা।

ষষ্ঠ বা সপ্তম শতকে নির্মিত হয়েছে চতুর্থ গুহাটি। এখানে রয়েছেন জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরস্বামী। কোন কোন তথ্যসূত্রে ইনি পার্শ্বনাথ বলে উল্লিখিত। শুনেছি পদ্মাবতী এবং অন্যান্য জৈন তীর্থঙ্করও মূর্ত হয়েছেন ভাস্কর্যে। মূর্তি রয়েছে আরো কিছু। তবে তাঁদের চিনে নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। চার গুহামন্দিরের মধ্যে চতুর্থ মন্দিরটি সবার শেষে নির্মিত হয়েছিল।

চিত্র-৪৬। ৪র্থ গুহার জৈনমূর্তি।

গাইড হিসেবে কাউকে নিইনি বলে অনেক তথ্য জানা সম্ভব হল না। ভেবেছিলুম চারটে গুহামন্দির দেখতে আবার ষাট টাকার গাইড কি দরকার! পাট্টাডাকালে চল্লিশ টাকায় অশোক বাডিগেরকে পাওয়া গিয়েছিল। পরে বুঝেছি – আমরা গাইড না নিয়ে ভুলই করেছিলাম।

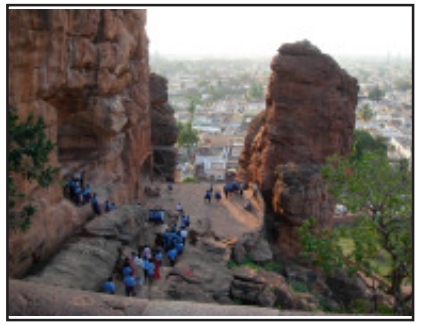

চিত্র-৪৭। অসম্পূর্ণ গুহা।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুহার মাঝখানে আরেকটি প্রাকৃতিক গুহা আছে। পঞ্চম গুহা বলা যায়। সম্ভবত এটি বৌদ্ধগুহা ছিল। কিন্তু নির্মাণের শুরুতেই পরিত্যক্ত হয়েছে। গুহা আকর্ষণীয় নয়, তবে শহরের দৃশ্যাবলী দেখার পক্ষে নাকি খুব সুন্দর। আমরা উপরে উঠে দেখিনি।

সিঁড়িপথ আরো উপরের দিকে উঠে গিয়েছে বাদামী দুর্গের দক্ষিণ ভাগে। পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত দুর্গ। চালুক্য রাজবংশের আমল থেকে দুর্গটি রয়েছে। হয়তো বা আরো অনেক আগে থেকেই। দক্ষিণে আর্যসভ্যতা বিস্তারেরও আগে। পরবর্তীকালে এটি টিপু সুলতানের অধিকারে আসে। টিপুর কামান আছে। শস্যাগার, কোষাগার ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে।

চিত্র-৪৮। অসম্পূর্ণ গুহা।

চিত্র-৪৯। শিবালয়।

বাদামীতে আপার শিবালয় নামে যে মন্দির আছে, তার শিখরদেশ চতুস্তল। ধাপে ধাপে পিরামিডের মতো ছোট হয়েছে। শিখর ও গ্রীবা বর্গাকার। গর্ভগৃহ ঘিরে প্রদক্ষিণ-পথ ও মণ্ডপ আছে। প্রদক্ষিণ পথ এবং মণ্ডপের দুপাশে ঢালু ছাদ। মাঝে সমতল ছাদ। এরকম খানিকটা সমতল ছাদ ও খানিকটা ঢালু চালাছাদ পরে আইহোলে দেখেছি। পাহাড়ের নিচেও মন্দির আছে লোয়ার শিবালয় নামে। সম্ভবত আদিতে এটি বিষ্ণুমন্দির ছিল, যদিও নাম হয়েছে শিবালয়। নির্মাতা হিসেবে দ্বিতীয় পুলকেশীর নামটাই প্রচারিত। আমাদের দেখা হয়নি।

বাদামীর উত্তর দিকের পাহাড়ে দুর্গের নিচে সপ্তম শতকে নির্মিত হয়েছিল মালেগিট্টি শিবালয়। বড়ো বড়ো বেলেপাথরের চাঁই দিয়ে তৈরী এটিও অন্যতম প্রাচীন মন্দির। লোকে বলে, মন্দিরটি কোন মালিনী ফুলওয়ালির তৈরী। তাই নাম হয়েছে মালেগিট্টি। পণ্ডিতী মতে, শিবের মাল্যরচনাকারী ভূমিকাই নাকি প্রকট হয়েছে মন্দিরে।

পূর্বমুখী দ্বিতল মন্দির। প্রদ(ণপথ নেই। গর্ভগৃহের সামনে বহিঃপ্রাচীর-ঘেরা মণ্ডপ। তার সামনে ছোট চার-থামওয়ালা মুক্ত(অলিন্দ বা মুখমণ্ডপ। সব একই অধিষ্ঠানের উপর। বাইরের দেয়াল আগুপিছু করে খাঁজ (ভদ্র) কাটা হয়েছে। কুটস্তম্ভে ঘেরা কুলুঙ্গিতে মূর্তি আছে। কোথাও রয়েছে জালি। বিমানের আদিতলের প্রস্তর-বরণ্ডিতে চার কর্ণকূট এবং চার ভদ্রশালা। সংযুক্ত(মণ্ডপের উপর আরো কর্ণকূট। দ্বিতলের চারধারে চার কর্ণকূট এবং চার ভদ্রশালা। তার উপরে অষ্টভুজাকার গ্রীবা ঘিরে রেখেছে কর্ণকূট। মধ্যদেশে চার নাসিকা। শিবালয়টি দ(ণী বিমান-শৈলী অনুসারে প্রথমদিককার চালুক্য-নির্মাণ রীতির এক উদাহরণ। মন্দির-স্থপতির নাম আর্য নিমচি।

চিত্র-৫০। অগস্ত্য লেক ও পাহাড়।

গুহাচত্বর থেকে চারদিকের সুন্দর দৃশ্যপট নজরে আসে। নিচে বাঁহাতে বাদামী শহর। উত্তর-দ(ণ-পশ্চিমের তিনটি দিক থেকে একখণ্ড সবুজ লেক ঘিরে রয়েছে অনুচ্চ খাড়াই লাল রঙের বেলেপাথরের পাহাড়। বাঁদিকটায় লেকের পশ্চিম পাড়ে একটি মসজিদ নজরে আসছে — মালিক আব্দুল আজিজের মসজিদ। তার কাছেই আরেকটি প্রাচীন মন্দির রয়েছে। লেকের উত্তর-পশ্চিম কোণায় বাদামী মিউজিয়াম। ডানহাতে ভূতনাথ মন্দির। সঙ্গে আরো কিছু মন্দির। লেকের পশ্চিমপাড়ে। মিউজিয়ামের ঠিক পিছনেই আবার পাহাড় উঠেছে খাড়া হয়ে। দুর্গের বু(জের মতো কত কিছু দেখা যাচ্ছে। আমার দৃঢ় বি(াস জন্মাল — ওখানে কোন-না-কোন রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আছে। নিশ্চয়ই আছে।

চিত্র-৫১। আব্দুল আজিজের মসজিদ।

— না থাকলেও জোর করে রাজপ্রাসাদ আছে বলবে নাকি! হাসতে হাসতে ভারতী বলে।

— না ঠিক তা নয়। তবে এত পুরোনো জায়গা, প্রাচীন গুহা, দুর্গ এতসব আছে, পাহাড়ের মাথায়ও মন্দির রয়েছে, আর রাজপ্রাসাদ থাকবে না?

বাদামী শহরের অবস্থান আমাদের বাঁদিকটায় — পূর্বদিকে। পরে শুনেছি, বাদামীর উত্তরদিকের দুর্গ বাওনবান্দে কোঠি (বাহান্ন প্রস্তরখণ্ডের দুর্গ) এবং দ(ণের দুর্গ রণমণ্ডল কোঠি (রণ(ত্র দুর্গ) নামে পরিচিত।

ভারতীকে বললাম — সত্যি, রাজধানী হিসেবে বাদামী একেবারে আদর্শ জায়গা। দেখেছ, কেমন সুন্দর প্রাকৃতিক সুর(া ব্যবস্থা রয়েছে। একের পর এক পাহাড় ঘিরে রেখেছে জায়গাটাকে। আবার জলের ব্যবস্থাও রয়েছে নিচের লেকে।

— সকালে বাসে করে আসার পথে এরকম পাহাড়-ঘেরা জায়গা নজরে পড়েছিল কিন্তু।

দেশী পর্যটক সংখ্যায় কম। বরঞ্চ বেশ কয়েকজন বিদেশী পর্যটকের দেখা পাওয়া গেল। বহিরাগত শ্বেতকায়রাও জানে ভারতবর্ষের কোথায় কোন দ্রষ্টব্য বস্তু আছে। তারা খুঁজেপেতে সেখানে বেড়াতে যায়। আমরা দেশবাসীরা ততটা জানি না। খবরই রাখি না তার। ইতিহাস ঐতিহ্য পরম্পরার প্রতি আমাদের আগ্রহ ও মমতা কম। শুধুই চর্বিতচর্বণ ও জীবনধারণ!

চিত্র-৫২। অগস্ত্য লেক ও ভূতনাথ মন্দির।

গুহামন্দিরের নিচের সরোবরটির প্রাচীন নাম অগস্ত্যতীর্থ। ঋষি অগস্ত্যর নামে। কেউ বলেন ভূতনাথ লেক। ভূতনাথ মানে শিব। মনে হয় এ নামকরণ হাল আমলের। সরোবরটি আদতে নাকি পঞ্চম শতকের নির্মাণ। একদা মানুষের ব্যবহারের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল এর সবুজ জল। লোকবি(াস — সরোবরের জলে স্নান করলে কুষ্ঠ থেকে নিরাময় হয়। বর্তমানে জল অতি সামান্যই রয়েছে। চোখের সামনে কাপড়-কাঁচা প্রাত্যহিক স্নানাদি ও অন্যান্য গার্হস্থ্যকর্ম যে গতিতে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, তাতে জলের পবিত্রতা ও স্বাস্থ্যকর গুণ আর অবশিষ্ট আছে বলে মনে হয় না।

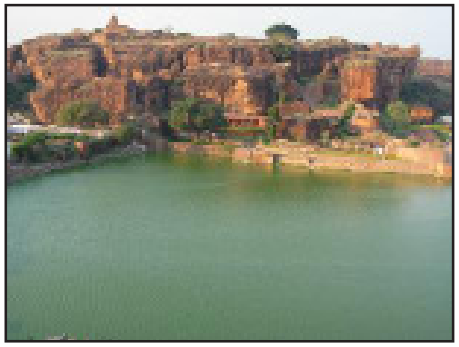

চিত্র-৫৩। অগস্ত্য লেক ও মিউজিয়াম।

বাদামীর মিউজিয়াম গুহামন্দিরের ঠিক বিপরীতে। লেকের উত্তর পাড়ে অবস্থিত ভূতনাথ মন্দির রোডে। শুত্র(বার বাদে সপ্তাহের অন্যদিন সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকে। প্রবেশমূল্য মাত্র দু' টাকা। গুহামন্দির দেখে নিচে নেমে আমাদের সর্টকাট পথ ধরে মিউজিয়াম যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম। একটু এগোতে দেখি বরাহনন্দন-অধ্যুষিত জনবসতির মধ্য দিয়ে গলিপথ এগিয়ে গিয়েছে। অতি জঘন্য পরিবেশ। এতই নোংরা যে মিউজিয়াম না দেখেই ফিরে যাব কি না ভাবছিলাম। নাকেমুখে (মাল-চাপা দিয়ে কোনরকমে দৌড়তে শু(করলাম। এরকম অত্যন্ত নোংরা পরিবেশের মধ্যে দ্রষ্টব্য স্থল নির্মিত হয়েছে কেন কে জানে!

মিউজিয়াম চত্বরে পৌঁছে অবশ্য ভালই লাগল। আসলে বড়ো রাস্তা থেকে সোজামুজি ভূতনাথ রোড ধরে গেলে এতটা নোংরা জায়গার ভিতর দিয়ে যেতে হত না। তবে তখন গুহামন্দির থেকে আমাদের অনেকটা ঘুরে যেতে হত। আমরা সোজাসুজি গুহা থেকে গিয়েছি বলে এমন হেনস্থা হতে হল। তবে একথাও ঠিক এদিক দিয়েও তো দর্শনার্থীদের যাতায়াতের জন্য পরিচ্ছন্ন রাস্তা থাকা উচিত ছিল। আসলে সর্টকাট রাস্তাটিই বিপজ্জনক। পারলে তা এড়িয়ে চলা উচিত।

ছোট মিউজিয়াম — মাত্র দুটি কামরায় সীমাবদ্ধ। একজনই পরিচারক রয়েছে। টিকিট-বিত্রে(তা কাম দারোয়ান কাম গাইড। স্থানীয় প্রত্নসামগ্রী সংর(ত। এখানে শিদলাফাদি গুহার এক মডেল দেখলাম। জায়গাটি একদা প্রাগৈতিহাসিক মানুষের আবাসস্থল ছিল। অর্থাৎ যখন মানুষ ইতিহাসের রাজ্যে প্রবেশ করেনি। প্রায়-মানুষ অবস্থা থেকে সবে মানুষ হয়েছে এবং ত্র(মশ বন্য জীবন থেকে সভ্যজীবনে পা রাখছে। সেই সব প্রাগৈতিহাসিক মানুষের ব্যবহৃত বস্তুর কিছু নমুনা সংগৃহীত মিউজিয়ামে। যেমন, নানা ধরণের পাথুরে অস্ত্র ও মাটির ব্যবহার্য সামগ্রী। ভারতীকে জিজ্ঞাসা করলাম — অটো করে আসার পথে পাহাড়ের নিচের দিকে এরকম দুটো পাহাড়ের কেভ দেখেছিলাম না? অবশ্য ঠিক কেভ বলা যায় না। মাথার উপর চওড়া পাথুরে ছাদ আর দুদিকে খোলামুখ।

— হ্যাঁ, অবিকল শিদলাফাদির মতো গুহা দেখেছি।

— প্রিহিস্টরিক মানুষের বসবাসের জন্য আদর্শ জায়গা।

মানুষের সভ্যতার ইতিহাস আমরা তবু কিছুটা জানি কিন্তু মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার প্রাক-ইতিহাস তেমন করে জানা হয়নি। প্রাইমেট থেকে নরসুলভ প্রাণী হওয়ার জন্মভূমি শুনেছি আফ্রিকায়। তারপর ছড়িয়ে পড়েছিল ইউরোপ-এশিয়ায়।

মিউজিয়মের বোর্ডে রয়েছে বাদামীর চালুক্য রাজবংশের ত্র(মপঞ্জী। সূত্রপাত রাজা জয়সিংহর আমল থেকে। তাঁর পুত্র রণরাগ। এঁদের কালনির্ণয় করা হয়নি। প্রথম রাজা যার কাল নিরূপণ করা সম্ভব হয়েছে তিনি কীর্তিবর্মন। তারপরে রাজা হন তাঁর ভাই মঙ্গলেশা।

কথায় কথায় আইহোলির কথা উঠল। পাট্টাডাকালে আমাদের বাস-বিভ্রাটের জন্য আইহোল দেখা হল না। সেকথা জানতে পেরে মিউজিয়ামের কর্মচারীটি বলল — আপনারা এক কাজ করতে পারেন। আগামীকাল লাগেজ নিয়ে চলে যান আইহোলি।

একটু কষ্ট করে বয়ে বেড়াতে হবে আর কী! আইহোলি দেখে ওখান থেকে বাস বা অটো ধরে চলে যান আমিনগড়। আমিনগড় থেকে বাস পাবেন হুনগুণ্ডের। সেখান থেকে হসপেট অনেক কাছে। প্রচুর গাড়ি আছে ও রাস্তায়। একটা না একটা পেয়ে যাবেন। পথের দূরত্বও কম হবে।

লেকের পশ্চিম পাড়ে ভূতনাথ মন্দির। বারবার সংস্কারের জন্য মন্দিরে বৈষ(ব, জৈন ও লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের ছাপ পড়েছে। একটি প্রাচীন লিপি পাওয়া গিয়েছে যার ধরণ থেকে অনুমান করা হচ্ছে, লিপি-রচনা হয়েছে নবম-দশম শতকে। আরো কিছু মন্দির রয়েছে লেকের পাড়ে। এর মধ্যে শিবাবতার লাকুলীশের মন্দিরও আছে।

মিউজিয়াম দেখে ওদিকে যেতে যেতে ফিরে এসেছি। আর রাজ্যের নোংরা মাড়িয়ে মন্দিরে যেতে ইচ্ছে করল না। মানতেই হবে, পর্যটক আকর্ষণের জন্য এই সব এলাকার প্রভূত উন্নতির প্রয়োজন আছে।

বাদামী শহরের প্রাণকেন্দ্রে জম্বুলিঙ্গ মন্দির। এটি ৬৯৯ খৃষ্টাব্দে নির্মিত। বোধ করি আদি জম্বুলিঙ্গ মন্দির নির্মাণ হয়েছিল তখন। দেবতা ব্রহ্মা-বিষু(-মহে(রের। সিলিংয়ের খোদাই-কাজ সুন্দর। চূড়ো বিজয়নগরের রাজারা তৈরী করেছিলেন। বিপরীতে দশম শতকের বিরূপা(মন্দির।

গুহামন্দির-মিউজিয়াম দেখে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে গেলাম শহরে। পথেঘাটে প্রচুর লোকজনের ভিড়। এদিকে কোথাও কোন মেলা বসেছে বা কোন উৎসব চলছে মনে হয়। গ্রামগঞ্জ থেকে ঝেঁটিয়ে এসেছে সব।

বললাম — একবার বাদামীর ট্যুরিস্ট ইনফর্মেশন সেন্টার ঘুরে গেলে হয় না?

— খুব হয়। ঘরে ফিরেই বা কি রাজকার্য হবে শুনি।

হোটেল ময়ূর চালুক্য চত্বরে রাজ্যের ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার। খোঁজ করছিলাম বাদামী-পাট্টাডাকলের উপরে কোন বই আছে কিনা। বলল — বইটই কিছু নেই, প্যাম্পলেট আছে।

ড্রয়ার হাতড়ে খানকয়েক কাগজ নিয়ে বললেন — এই নিন। এর থেকে পর্যটন তথ্য পাবেন। তার বেশি কিছু পাবেন না। সেসব খুঁজতে হবে আর্কিওলজিকাল ডিপার্টমেন্টে। হাম্পির বইটই, আপনারা হাম্পিতে খোঁজ করলে পাবেন মনে হয়। আর হ্যাঁ, অবশ্যই থাকবেন আমাদের কমলপুর বা হাম্পি বাজারের হোটেলে। ওখানে আছেন মিস্টার ... । না, বুকিংয়ের দরকার নেই। আমার নাম করবেন অসুবিধে হলে।

বনশঙ্করী মন্দির বাদামী থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে। প্রাচীন মন্দির। স্থানীয়দের কাছে বনশঙ্করী দেবী বিশেষভাবে আদৃতা। সিংহারূঢ়া দশভুজা শতাী শাকম্ভরী দুর্গাই বনশঙ্করী। মর্মর মূর্তি পূজিত হচ্ছে। দেবী-মন্দিরের সামনে যে পুষ্করিনী আছে তা হরিশ্চন্দ্র তীর্থ নামে খ্যাত। অনেকেই বলছিল — এতদূর এসেছেন যখন দেখে আসুন।

আমাদের হাতে সময় নেই। যাব না শুনে, তাদের মধ্যে হতাশার ভাব ল(্য করা গেল।

মহাকুট্টেশ্বরের মন্দিরও পাঁচ কিলেমিটার দূরে। অবস্থান মহাকূট পাহাড়ের চূড়োয়। সপ্তম শতকে চালুক্য রীতিতে গড়া মন্দিরটি রয়েছে একেবারে জঙ্গলের মধ্যে। একটি প্রস্রবণ আছে এবং তার জলে পরিপুষ্ট পুষ্করিনী আছে। গর্ভগৃহ-মণ্ডপের সামনে মুক্ত(মুখমণ্ডপ। দেয়ালের কুলুঙ্গিতে শিবের মূর্তি। অষ্টভুজ মন্দির-বিমানের গ্রীবা ও শিখরের স্তূপী। চত্বরে আরো কিছু মন্দির আছে ভাস্কর্যে সমৃদ্ধ হয়ে। মল্লিকার্জুন মন্দির নিয়ে দু' ডজন শিব-মন্দির হবে। চালুক্যরাজ মঙ্গলেশা কলচুরির রাজা বুদ্ধরাজকে পরাস্ত করে দেবতা মহাকুটেশ্বরের অর্চনা করেন এবং ৬০২ খৃষ্টাব্দে এখানে এক ধর্মস্তম্ভ স্থাপন করেন।

আইহোল থেকে সাত কিলোমিটার দূরে সিদ্দিনাকোল্লা উপত্যকায় আছে এক জলপ্রপাত। নিচে প্রাচীন সঙ্গমেশ্বরের মন্দির। আজো পূজাপাঠ হয় সেখানে। তার কথাও বলছিল স্থানীয় লোকজন। আমাদের আর মন্দির দেখার দম নেই। চৌদ্দ ঘন্টা বাস জার্নি করে এসেই আবার বেরিয়ে পড়া হয়েছে পাট্টাডাকাল-বাদামী দেখতে। বয়সের প(একটু বেশিই শ্রমসাপে(ব্যাপার হয়ে গিয়েছে।

হোটেলে ফিরে এক পে-ট দ(িণ ভারতীয় খাদ্য অর্ডার দিলাম। দুজনে ভাগ করে খেলাম। একটু বিশ্রাম দরকার। বড্ড ধকল গিয়েছে সারাদিন। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হবে। তার আগে কোলকাতায় ফোন করতে হবে। প্রথমে দীপিকার কাছে, তারপর

সন্দীপ্তর খোঁজে নিখিলের কাছে। ভাগ্য ভালো চট করে লাইন পাওয়া গেল।

ঠিক করেছি আগামীকাল সকালে একবার যা-থাকে-কপালে বলে আইহোলের দিকে পাড়ি দেব। ঘুরে এসে দুপুরের বাসে গডগ হয়ে হসপেট চলে যাব। সমস্যা হল লাগেজ কোথায় রেখে যাই। ইতিমধ্যে বাসস্ট্যাণ্ডের সময়সারণী দেখে আমরা কানাড়া ভাষায় লেখা 'গডগ' কথাটি চিনতে পেরেছি — কারণ গডগ আসলে তিন অ(রের শব্দ যার শু(ও শেষে একই রকমের গ-অ(র আছে। যা মনে হচ্ছে গডগের বাস আধ ঘন্টা অন্তর পাওয়া যায়। ৬৩ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর গডগ বাসস্ট্যাণ্ড। আঙ্কোলা হুবলি হসপেট হয়ে গুটির দিকে প্রসারিত জাতীয় সড়ক ৬৩ নম্বর। হসপেট থেকে পশ্চিমে গডগ — দূরত্ব ৯০ কিলোমিটার। আরো ৭০ কিলোমিটার উত্তরে বাদামী। মোট পথ ১৬০ কিলোমিটার। দুপুর নাগাদ যাত্রা করলে সন্ধ্যের মধ্যে হসপেট পৌঁছে যাওয়া যাবে। ঘন্টা পাঁচেকের জার্নি হবে মনে হয়।

হসপেট-কুস্তাগি-হুনগাণ্ড হয়ে বিজাপুরের দিকে ন্যাশনাল হাইওয়ে-১৩ গিয়েছে আইহোলির পূর্ব দিয়ে। এ পথে ধরেই আইহোল থেকে যাওয়ার কথা বলছিল বাদামী মিউজিয়ামের সেই কর্মচারী। হসপেট থেকে ট্রেনে গডগের দূরত্ব ৮৬ কিলোমিটার। যশবন্তপুর হুবলি-হাম্পি এক্সপ্রেস সকাল আটটায় ছাড়ে। অমরাবতী এক্সপ্রেস ৮-৫০ ছাড়ে। বিপরীতে গডগ থেকে সন্ধ্যা ছটায় ট্রেন আছে ডাউন হাম্পি এক্সপ্রেস। দুঘন্টায় পৌঁছে দেয় হসপেট। দুপুরে ডাউন অমরাবতী এক্সপ্রেস। দ(িণ ভারতে ট্রেনের থেকে বাসে চলাফেরায় সুবিধে বেশি।

রাতে জামাকাপড় জিনিসপত্র স্যুটকেসে খানিকটা গুছিয়ে রাখা হল। রিসেপশনে হোটেলের ম্যানেজার সুরেশ হলকুর্কি মিশুকে এবং আড্ডাবাজ যুবক। বললাম — আমরা কাল সকালেই ঘর ছেড়ে দেব। সকালে আইহোল যাব। ফিরে এসে এখানে লাঞ্চ সেরে হসপেটের বাস ধরব। আপনারা আমাদের দুটো লাগেজ একটু রেখে দেবেন কি?

— নিশ্চয়ই, এটা কোন ব্যাপার নয়। সানন্দে রাজি হয়ে গেল সুরেশ।